নদীর ওপার

- সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

নদীর ওপার

সকালবেলা ছিল অপূর্ব সুন্দর একটা দিনের সম্ভাবনা। আকাশে মেঘ নেই, ঝকঝক করছে রোদ, নরম শীতের বাতাস। এই সব দিনে মনে হয়, আঃ, বেঁচে থাকা কি আনন্দের! ভাগ্যিস মানুষ হয়ে জন্মেছিলাম। তখন মনে পড়ে না, দু'একদিন বা দু'চার ঘণ্টা বাদে কি ঘটবে। মনে পড়ে না, ঠিক সেই মুহূর্তে পৃথিবীর অন্য কোথাও হয়তো কেউ শুধু বেঁচে থাকবার জন্য, শেষ দু'একটি নিশ্বাস নেবার জন্য, কি রকম আকুলি-বিকুলি করছে।

ছুটির দিন। টিফিন-ক্যারিয়ারে আলুরদম, ডিম-সেদ্ধ, পরোটা ভরা হয়ে গেছে। রাস্তা থেকে মিষ্টি কিনে নেওয়া হবে। ড্রাইভার পুরনো ডজ গাড়িটা ধুয়ে-মুছে ঝকঝকে করে ফেলেছে। আর সবাই তৈরি, শুধু মেয়েদের সাজগোজ আর শেষ হয় না। এক একবার বেরিয়ে এসেও আবার কিছু একটা ভুলে গিয়ে বাড়ির মধ্যে ফিরে যায়!

হায়দ্রাবাদ টাউন মিউনিসিপ্যালিটির চীফ এঞ্জিনীয়ার গগনেন্দ্রনাথ সরকার আজ ধুতি ও ফ্লানেলের পাঞ্জাবি পরেছেন, কাঁধের ওপর রাখা একটি জামেয়ার, হাতে রুপো-বাঁধানো ছড়ি। তিনি বারান্দায় দাঁড়িয়ে একটু অধৈর্য ভাবে বললেন, বড়বৌমা, সাড়ে আটটা বেজে গেল—এরপর পৌঁছুতে অনেক দেরি হয়ে যাবে যে!

গগনেন্দ্রনাথের ছোটছেলে প্রিয়ব্রত—তেরো বছর বয়েস—সে আগে থেকেই গাড়িতে উঠে বসে আছে। বড়ছেলে দেবব্রত অফিসের কাজে বম্বে গেছে—সে এসে পৌঁছতে পারল না, সন্ধ্যাবেলা তার ফেরার কথা।

গগনেন্দ্রনাথ সারাজীবন কতরকম দায়িত্বপূর্ণ চাকরি করেছেন—কিন্তু বাড়ির লোকজনদের নিয়ে কোথাও বেরুতে গেলেই ভীষণ ভয়,

কিছু যেন একটা ব্যবস্থা বাকি থেকে যাচ্ছে।

বড়ছেলের বউ মাধুরী বেরিয়ে এসে বলল, এই তো বাবা, হয়ে গেছে আমাদের। ওঁরা এখুনি আসছেন।

গগনেন্দ্র বললেন, তোমার মাকে তাড়া দাও। বেরুতেই যদি দুপুর হয়ে যায় তাহলে কতক্ষণ আর থাকা হবে? তপুর বুঝি এখনো হয়নি? দেখবে, ও-ই সবচেয়ে দেরি করবে।

সে কথাই ঠিক। অন্য সকলে বেরিয়ে আসার পরও তপতীই এক্ষুনি আসছি, এক্ষুনি আসছি বলে আরও দেরি করতে লাগল। সে কুমারী, যুবতী, তার সাজপোশাকের ঘটা বেশি তো হবেই।

তপতী বেরিয়ে এল—তাকে দেখে সবাই অবাক। সে পরেছে পুরুষদের মতন ট্রাউজার্স, তার ওপর রঙীন ফুল ফুল ছাপ পাঞ্জাবি।

গগনেন্দ্রনাথ বললেন, এ আবার কি? তুই এরকম ভাবে যাবি নাকি?

তপতী বাবাকে মৃদু ধমক দিয়ে বলল, বাবা, তুমি কিছু বলবে না বলছি! আজকাল অনেকেই এরকম পরে!

—এ তো ছেলেদের পোশাক!

—মোটেই না। দাদাকে জিজ্ঞেস কর—বম্বের মেয়েরা এরকম পরে কি না?

—লোকে হাসবে না তো তোকে দেখে।

—মোটেই না!

তপতীর মা মন্দাকিনী আর মাধুরী অবশ্য মুখ টিপে হাসছে। উনিশ বছর বয়েস হলেও তপতী এখনও ছেলেমানুষ—অদ্ভুত ধরনের কিছু না করলে ও আনন্দ পায় না।

মাধুরী পরেছে চওড়া লাল পাড়ের একটা গরদের শাড়ি। সদ্য স্নান করে তার স্নিগ্ধ মুখের সঙ্গে শাড়িটা খুব সুন্দর মানিয়েছে।

তপতী বলল, বৌদি, তুমি এটা পরলে কেন আজ? পুজো করতে যাচ্ছ নাকি?

মাধুরী কিছু বলবার আগে তার শাশুড়ি বলল, এই তো বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে। ঘরের বউ কি তোর মতন মেমসাহেব সাজবে নাকি?

তপতী বলল, ঘরের বউ হলেই যে সব সময় বউ বউ হয়ে থাকতে হবে—তার কোন মানে নেই! আজকাল আর ওসব চলে না। দাদা মোটেই পছন্দ করে না।

—তুই চুপ কর তো! দেখব, তোর বিয়েটা হোক, তারপর দেখব, তুই তখন কি রকম মেমসাহেব সাজিস?

ওদিক থেকে প্রিয়ব্রত তাড়া দিল, তোমরা কি এখনো গল্পই করবে? মা, এসো—

গাড়ি ছাড়ল। প্রিয়ব্রত ড্রাইভারের পাশের সীটে বসে আছে—ঐ জায়গাটা তার বাঁধা। সে বৌদিকে পথের বর্ণনা দিচ্ছে। আজ গোলকুণ্ডা ফোর্ট-এ যাওয়া হবে। যদিও গোলকুণ্ডা ফোর্ট ওদের সবারই আগে দেখা—তবু ওখানে গিয়ে পিকনিক করাই আসল উদ্দেশ্য।

একটি সুখী সম্পন্ন পরিবার। গগনেন্দ্রনাথ বহুকাল থেকেই প্রবাসী বাঙালী। তিনি যখন পাশ করে বেরোন—তখন বাংলাদেশে লীগ মিনিস্ট্রি চলছে, তাঁর মতন যুবকদের ভাল চাকরি পাওয়ার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। রাগ করে তিনি কলকাতা ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন ভাগ্য-অন্বেষণে। ঘুরতে ঘুরতে চলে আসেন হায়দ্রাবাদে। হায়দ্রাবাদে তখন দেশীয় রাজা নিজামের আমল। বাংলাদেশে তিনি যোগ্যতা সত্ত্বেও উঁচু চাকরি পান নি—কিন্তু নিজামের অধীনে তিনি ভাল কাজ পেয়ে গেলেন। সেই থেকেই এখানেই বসতি। ধাপে ধাপে উন্নতি করেছেন—আর দু'বছর বাদে রিটায়ার করার কথা। এদিকে তাঁর বড়-ছেলেকেও এঞ্জিনীয়ারিং পড়িয়ে বিলেতে পাঠিয়েছিলেন—ছেলে মেম বিয়ে করেনি, বিদেশে থেকে যাবার বায়না ধরেনি, যথা-ফিরে এসে এখানেই স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ডে উপযুক্ত চাকরি পেয়ে

গেছে! নিজে পছন্দ করে ছেলের বিয়ে দিয়েছেন গগনেন্দ্রনাথ। এমন চমৎকার বউ, যেমন লক্ষ্মীশ্রী, তেমন নম্র স্বভাব। মেয়ে কলেজে পড়ছে—তার বিয়ের কথাবার্তাও প্রায় ঠিকঠাক। ছোটছেলেও পড়াশুনোতে ভাল। কোথাও কোন অশান্তি নেই—গগনেন্দ্র সরকারের মত সার্থক পিতা এদেশে ক'টি? একটি সুখী পরিবার পিকনিকে যাচ্ছে। দেবব্রত উপস্থিত থাকলে আরও সর্বাঙ্গসুন্দর হত। একটি উজ্জল আনন্দময় দিন। আকাশে মেঘের ছায়া পর্যন্ত নেই।

ঠিক সেই সময় বোম্বাইয়ের একটা হোটেলের ঘরে দেবব্রত দাড়ি কামাচ্ছিল। খালি গা পাজামার দড়ি আলগা, চুল ঝুলে পড়েছে কপালে। একটু আগে সে ঘুম থেকে উঠেছে। গতকাল সন্ধ্যায় সে একটি পার্টিতে গিয়েছিল, ফিরতে অনেক রাত হয়েছে। চোখে তার এখনো অতৃপ্ত ঘুমের চিহ্ন।

দেবব্রতর সুন্দর স্বাস্থ্য বেশ লম্বা, প্রশস্ত কাঁধ, গৌরবর্ণ। ছেলেবেলা থেকেই তার খেলাধুলোর দিকে ঝোঁক। ছাত্র বয়সে ভাল ক্রিকেট খেলত, এখনো টেনিস খেলার অভ্যেস রেখেছে। প্রত্যেকদিন ঘুম থেকে উঠেই সে কয়েকবার ডন-বৈঠক করে নেয়।

দাড়ি কামাতে কামাতে দেবব্রত অন্যমনস্ক ভাবে ভাবছিল তার বাড়ির কথা, আজ সবাই পিকনিকে যাবে। দেবব্রত যোগ দিতে পারল না—কাল সন্ধ্যার পার্টির জন্য তাকে থেকে যেতে হল—আজও দুপুরে কেবল কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজারের সঙ্গে আর একটু কথা বলে নিতে হবে। তারপর সন্ধ্যের সময় প্লেন। সাড়ে সাতটার সময় সে বাড়ি পৌঁছে যাবে—ততক্ষণে কি ওরা পিকনিক থেকে ফিরবে?

দেবব্রতর ফর্সা মুখে দাড়ি কামাবার পরও একটা নীলচে আভা পড়ে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সে ঠোঁট উল্টে, চিবুকে হাত ঘষে দেখতে লাগল। তারপর স্নান করতে ঢুকল বাথরুমে। আজ ছুটির দিন, আজ তার বেশীক্ষণ বিছানায় শুয়ে শুয়ে আলস্য করার কথা। দেবব্রতর চোখের সামনে ভেসে উঠল মাধুরীর মুখখানা, তার টুসটুসে

ঠোঁট। কাল সে বাড়ি ফিরতে পারেনি বলে মাধুরী নিশ্চয়ই খুব অভিমান করেছে। একটু রাগ করলে মাধুরীকে আরও সুন্দর দেখায়। মাধুরী এমনিতে খুব শান্ত, কখনো উঁচু গলায় কথা বলে না—কিন্তু সে রেগে গেলে কি রকম তেজী হয়ে যায়—সে-পরিচয় শুধু দেবব্রত জানে!

বিয়ে হয়েছে চার বছর কিন্তু দেবব্রত মাধুরীকে খুব বেশী সময় কাছে পায়নি। চাকরি পাওয়ার পরই দেবব্রতকে কানপুরে বেশ কিছুদিন থাকতে হয়েছিল ট্রেনিংয়ের জন্য। মাধুরীর বাবা মারা যাবার আগে যখন খুব অসুখে ভুগছিলেন—তখন মাধুরীকে বাপের বাড়ীতে গিয়ে থাকতে হয়েছিল দু'মাস। তা ছাড়াও দেবব্রতকে প্রায়ই অফিসের কাজে বাইরে যেতে হয়। টুর থেকে ফিরে প্রত্যেকবার মাধুরীকে মনে হয় নতুন।

স্নান করে বেরিয়ে দেবব্রত সারা গায়ে পাউডার ছড়াল। এখন সে সম্পূর্ণ উলঙ্গ। হোটেলের একলা ঘরে এই অবস্থায় থাকতে তার দ্বিধা হয় না—এই অভ্যেসটি রপ্ত করেছে বিলেত থেকে। দরজায় ঠক ঠক শব্দ হতেই দেবব্রত বলল, এক মিনিট!

দ্রুত পোশাক পরে নিয়ে দেবব্রত দরজা খুলল। বেয়ারা ব্রেকফাস্ট নিয়ে এসেছে। ফলের রস, দুটি ডিমের পোচ, বেগুন ভাজা, সেঁকা পাউরুটি, মাখন, কলা আর কফি। বেশ তৃপ্তি করে খাবার শেষ করে দেবব্রত হোটেলের ঘর থেকে বেরুলো। আবার সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এসে সুটকেস থেকে টাকাপয়সাগুলো সব বার করে পকেটে ভরল। তারপর নিচে নেমে এসে হোটেলে কাউন্টারের চাবি জমা দিয়ে বলল, আমি আজ বিকেলে ছ'টার সময় চলে যাব। তার আগে আমার বিল তৈরী করে রাখবেন।

দেবব্রত যখন চার্চগেটে এসে পৌঁছলো—তখন তাকে দেখে মনে হবে একটি পরিতৃপ্ত, সুখী যুবা। তার চেহারা ও স্বাস্থ্য সুন্দর, জীবনে প্রতিষ্ঠিত, এবং সে পেয়েছে একটি শান্তিময় সংসার। খুব

আরাম করে সিগারেট টানতে টানতে দেবব্রত একটা ট্যাক্সির অপেক্ষায় দাঁড়াল।

একটি পারিবারিক গল্পের নায়ক হিসেবে দেবব্রতকে বেশ চমৎকার মানায়। সে দেখতে সুন্দর এবং জীবনে প্রতিষ্ঠিত। সে একটি সংসারে সুখ আনতে পারে, আবার ভাঙনও ধরিয়ে দিতে পারে।

সুখ ও আনন্দের একটা ভারসাম্য আছে। সামান্য সূক্ষ্ম পরিবর্তনেই সে ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়। যেমন, এখানে দেবব্রত দাঁড়িয়ে, ওদিকে মোটরগাড়ি করে তার পরিবারের অন্যান্যরা পিকনিকে যাচ্ছে—এই দৃশ্যের মধ্যে কোন খুঁত নেই। হঠাৎ একটু ভারসাম্য টলে গেল।

দেবব্রত এখন এই রাস্তার ওপরেই দাঁড়িয়ে থাক। আমরা পিকনিক যাত্রীদেরই দেখি।

গোলকুণ্ডা দুর্গ বেশী দূরে নয়। মিনিট কুড়ির মধ্যেই ওরা পৌঁছে গেল। ঔরঙ্গজেবের আমল থেকে পরিত্যক্ত এই দুর্গ আজও প্রচুর দর্শক আকর্ষণ করে। ছুটির দিন বলে বেশ ভিড়। গগনেন্দ্রনাথ দুর্গের প্রবেশপথের কাছেই একটা চত্বরে জায়গা বেছে নিলেন বসবার জন্য, ভিড়ের মধ্যে যাবেন না। ড্রাইভার জিনিসপত্র নামাল।

কিন্তু প্রিয়ব্রত আর তপতী শুধু এক জায়গায় বসে থাকতে চায় না। তারা সবাই ছোটাছুটি করবে—ঢুকবে সেই ঘরে যেখানে হাততালি দিলে ওপরে প্রতিধ্বনি হয়! সিঁড়ি গুনে গুনে উঠবে পাহাড়চূড়োয় দুর্গের মূল অংশে।

মাধুরী যেতে চাইল না। ভক্তিমতি বৌ হিসেবে তার উচিত শ্বশুর-শাশুড়ির কাছাকাছি থাকা। প্রিয়ব্রত সে কথা শুনল না, জোর করে মাধুরীর হাত ধরে টেনে তুলে বলল, না বৌদি, তোমাকে যেতেই হবে! এসো, শিগগির এসো!

মাধুরী বলল, আমি আবার গিয়ে কি করব? আমি তো একবার দেখেছি!

—তা হোক! এসো আমাদের সঙ্গে।

—মাধুরীর শাশুড়ি মন্দাকিনী বললেন, বৌমা, যাও না, ওরা বলছে যখন। এই, তোরা তাড়াতাড়ি ফিরবি কিন্তু!

শ্বশুর-শাশুড়ির কাছ থেকে খানিকটা দূরে এসেই মাধুরী চঞ্চলা যুবতী হয়ে গেল। তার বয়েস সবে মাত্র একুশ—এই বয়েসে অনেক মেয়ে কুমারী থাকে। মাধুরী পাল্লা দিয়ে ছুটতে লাগল ওদের সঙ্গে। সিঁড়ি দিয়ে অর্ধেকটা পাহাড়ে ওঠার পর হাঁপিয়ে গেল তিনজনেই। তারপর সিঁড়ির পাশেই একটা খোপ মতন জায়গায় বিশ্রাম নেবার জন্য বসল—যেখানে একসময় বর্শা বন্দুক হাতে সিপাহীরা পাহারা দিত।

প্রিয়ব্রত বলল, ইস, বাদাম কিনে আনলে হত! বৌদি পয়সা দাও না!

মাধুরী বলল, পয়সা কোথায় পাব? আমি তো ব্যাগই আনিনি।

—তুমি বড্ড কিপ্টে হচ্ছ আজকাল।

—এখন আর বাদাম খেতে হবে না।

—নিচে কি চমৎকার ঝালচানা বিক্রী হচ্ছে।

তপতী বলল, আমার ব্যাগটা গাড়িতে ফেলে এসেছি।

প্রিয়ব্রত তক্ষুণি নেমে পড়ে বলল, আমি নিচ থেকে আসছি।

কথাটা বলেই প্রিয়ব্রত ছুটতে শুরু করেছে। মাধুরী ডাকল, এই প্রিয়, যাসনি, বাবা বকুনি দেবেন!

কে শোনে কার কথা, প্রিয়ব্রত তখন অনেকটা নেমে গেছে। মাধুরী আর তপতী অগত্যা পা ঝুলিয়ে বসে গল্প করতে লাগল, কিন্তু দু'জন সুন্দরী যুবতীকে প্রকাশ্য জায়গায় বসে গল্প করার সুযোগ আমাদের সমাজ দেয় না। সিঁড়ি দিয়ে ওঠা নামা করছে যত মানুষ, ওদের দিকে তাকিয়ে দেখছে! অসংখ্য কৌতূহলী চোখ, নানা মন্তব্য। কয়েকটি বাঙালী ছেলে ওদের অবাঙালী মনে করে বাংলায় কদর্য উক্তি করে চলে গেল। আর কয়েকটি হায়দ্রাবাদী যুবক

থমকে দাঁড়িয়ে গেল ওদের কাছাকাছি, পরস্পরের গা ঠেলাঠেলি করে নানারকম অসভ্য ইঙ্গিত।

তপতী এসব গ্রাহ্যই করছে না। সে যেন অন্যদের দেখতেই পাচ্ছে না এই ভঙ্গিতে গল্প করে যেতে লাগল। মাধুরীর খুব অস্বস্তি হচ্ছে, একটু একটু ভয়ও পাচ্ছে। একবার সে তপতীকে বলল, চলো, আমরা নিচে নেমে যাই! তপতী সে কথায় ভ্রূক্ষেপ করল না।

যুবকগুলি আরও কাছে এগিয়ে এল, অসভ্যের মতন একেবারে ওদের গা ঘেঁষে দাঁড়াল অথচ ওদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলারও সাহস নেই। শেষ পর্যন্ত তপতী আর থাকতে পারল না। চোস্ত উর্দুতে জিজ্ঞেস করল, আপনারা এখানে এসে দাঁড়িয়েছেন কেন? সরে যেতে পারছেন না!

যুবকদের মধ্যে একজন তপতীর পোশাকের দিকে ইঙ্গিত করে বলল, দেখছি, আপনি লেড়কি না লেড়কা!

রাগে মুখ-চোখ লাল হয়ে গেল তপতীর। সে আর কিছুও বলতে যাচ্ছিল, মাধুরী জোর করে তার হাত ধরে টেনে হাঁটতে শুরু করল। এই সময় হাঁপাতে হাঁপাতে এসে পৌঁছল প্রিয়ব্রত।

আর বিশেষ কিছু ঘটল না—ছোকরারা হাসাহাসি করতে করতে নেমে গেল। ওরা আবার উঠতে লাগল ওপরের দিকে। এই সামান্য ঘটনাতেই ওদের মেজাজ বিগড়ে গেছে। একটু আগে পৃথিবীটা কত সুন্দর ছিল, এখন তপতীর মনে হচ্ছে পৃথিবীটা অতি বাজে জায়গা।

একটুক্ষণ বাদে মাধুরী বলল, আমাদের প্রিয়কে দেখেই কিন্তু ছেলেগুলো চলে গেল। প্রিয়কেও তা হলে লোকে ভয় পায়?

তপতী বলল, হ্যাঁ, ওকে দেখে ভয় পেয়েছে না হাতী! ওই তো ডিগডিগে চেহারা!

একমুখ চানাচুর মুখে নিয়ে প্রিয়ব্রত বলল, কেন তোমাদের কেউ কিছু বলেছে?

ওপরে ওঠার পর মেজাজটা আবার একটু একটু করে ভাল হতে লাগল। ছোট পাহাড়, তবু ওপর থেকে বহুদূরের প্রান্তর পর্যন্ত দেখা যায়। আকাশ যেন অনেকটা কাছে। একসঙ্গে এতখানি আকাশ ও এতখানি পৃথিবী দেখলে মনটা একটু উদাস হয়ে যায়। মানুষ এইজন্যই পাহাড়ে আসে।

দুর্গের চূড়ায় ওরা অনেকটা সময় কাটাল। প্রিয়ব্রত তো নামতেই চায় না। মাধুরীই তাড়া দিতে লাগল। শেষ পর্যন্ত ওরা এল দুর্গের শেষ ঘরটিতে। এই ঘরের একটা দেয়ালে একখণ্ড বড় পাথর চাপা দেওয়া আছে।

প্রিয়ব্রত জিজ্ঞেস করল, বৌদি, এই পাথরটার পেছনে কি আছে জান তো?

—কি?

—এর পেছনে একটা মস্তবড় সুড়ঙ্গ আছে। আগেকার রাজারা শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে হেরে গেলে এই সুড়ঙ্গ দিয়ে পালিয়ে যেতেন। এটা এখান থেকে আরম্ভ হয়ে একদম নদীর ধারে শেষ হয়েছে। কি অন্ধকার!

—তাই বুঝি ঢুকে দেখেছিস!

—এখন এটার মধ্যে কেউ ঢোকে না। এটার মধ্যে নাকি দুটো মস্তবড় অজগর সাপ আছে। একবার এক সাহেব ঢুকেছিল—তারপর আর তাকে খুঁজেই পাওয়া যায় নি। সেইজন্যেই তো পাথর দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছে এখন। দাদা যখন কলেজে পড়ত, তখন দাদা একবার ঢুকতে চেয়েছিল—তোর মনে আছে দিদি?

তপতী বলল, দাদার সব তাতেই বাড়াবাড়ি!

প্রিয়ব্রত তার দাদার বিষম ভক্ত। সে জোর দিয়ে বললে, দাদা ঢুকলে ঠিক বেরিয়ে আসত। দাদার মতন সাহস কারুর নেই!

দেবব্রত প্রসঙ্গে মাধুরী একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল। দু'এক মুহূর্ত মাত্র। তারপরই সে প্রিয়ব্রতকে রাগাবার জন্য বলল, ইস,

তোমার দাদার কত সাহস আমার জানতে বাকি নেই। ইঁদুর দেখলে ভয় পায়।

—মোটেই না!

নিচে নেমে দেখা গেল গগনেন্দ্র ইতিমধ্যে আর এক জোড়া প্রৌঢ় মারাঠী দম্পতির সঙ্গে খুব ভাব জমিয়ে ফেলেছেন। মন্দাকিনী কিনেছেন তিনখানা কার্পেটের আসন, দুখানা পাথরের বাটি। একজন কাঠের খেলনাওয়ালা ওঁর সামনে খুব ঝুলোঝুলি করছে, উনি কিছুতেই কিনবেন না।

খাওয়া-দাওয়া শেষ করে ওঁরা গাড়ি নিয়ে আবার বেরিয়ে পড়লেন। যাওয়া হল সেকেন্দ্রাবাদ পর্যন্ত। পথে কোথাও কোথাও নামা ও মেয়েদের জিনিসপত্তর কেনাকাটিতে বিকেল গড়িয়ে গেল। বাড়ি ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যে—তখন হোসেন সাগর ও ওসমান সাগরে শেষ সূর্যের লাল আভা ছড়িয়ে পড়েছে।

বাড়ি ফিরেই দেবব্রতকে নিয়ে আসার জন্য গাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হল এয়ারপোর্টে। একটুবাদেই দেবব্রতর বন্ধু জাফর এসে হাজির হল। জিজ্ঞেস করল, দেব এখনো আসেনি?

জাফর হায়দ্রাবাদের নিজামের মন্ত্রী-পরিবারের ছেলে। চেহারায় সম্ভ্রান্ত বংশের ছাপ। যেমন সুদর্শন, তেমনি গুণবান। সে দেবব্রতর স্কুল-জীবন থেকে বন্ধু। বাংলা সম্পর্কে তার আগ্রহ আছে। রবীন্দ্রনাথ পড়বে বলে ইদানীং বাংলা শিখতে শুরু করেছে। এ বাড়িতে এসে সে বাংলায় কথা বলার চেষ্টা করে।

জাফর এলে এ বাড়িতে সবাই খুশি হয়। সে খুবই প্রাণবন্ত মানুষ—খুব ছোট বয়েস থেকেই এ বাড়িতে আসছে বলে সবারই সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা। বাড়ির মেয়েরাও নিঃসংকোচে তার সামনে আসে, গল্প করে। প্রিয়ব্রত সাড়ম্বরে তাকে শোনাতে লাগল আজকের পিকনিকের কাহিনী। গগনেন্দ্র কিছুক্ষণ বসে জাফরের সঙ্গে রাজনীতি ও দেশের অবস্থা আলোচনা করলেন। তপতী আসতেই জাফর

জিজ্ঞেস করলেন, কি, হবে এক বাজি চেস?

এইটুকু বয়সেই তপতী বেশ ভাল দাবা খেলে, এ বাড়িতে দাবা খেলার খুব চলন আছে। এমনকি প্রিয়ব্রতও অনেকটা খেলতে শিখেছে। তবে সবচেয়ে ভাল খেলে মাধুরী। তার ধৈর্য বেশী, সে চট করে ভুল চাল দেয় না কখনো। জাফরও এ খেলায় দুর্ধর্ষ।

জাফর মিনিট কুড়িকের মধ্যে তপতীকে মাত করে দিল। মাধুরী তাকে চা ও জলখাবার দিতে এলে জাফর বলল, আরে বহু, তোমার দেখাই পাচ্ছি না। খেলা হবে একটু?

মাধুরী হেসে বলল, আমার এখন সময় নেই। সন্ধ্যেবেলা বুঝি দাবা খেলতে বসা?

জাফর বলল, বুঝেছি! হাসব্যান্ড আসছে তো—স্পেসাল সব খাবার তৈয়ার হচ্ছে। না?

—আপনিও রাত্তিরে এখানে খেয়ে যান না।

—উঁহু! আনইনভাইটেড কেন খাব? একদিন ইনভাইট করে খাওয়ান!

—ইনভাইট-এর বাংলা কি?

—ইনভাইট? লেট মি সি—বলবেন না, বলবেন না,—জানি—আমন্ত্রণ?

—তাও হয়। আমরা মুখে বলি নেমন্তন্ন।

—কবে নিমন্তন্ন করছেন?

তপতী একটা ভুল চাল দেওয়ায় মাধুরী বলল, এই ওটা কি করছ? ঘোড়াটা যে যাবে!

তপতী হাসতে হাসতে বলল, তাহলে তুমিই খেল না বাবা।

মাধুরী বলল, আমি পারব না। এক্ষুনি মা ডাকবেন।

কথা বলতে বলতেই মাধুরী একটু উদ্বিগ্নভাবে দেয়ালঘড়ির দিকে তাকাল। সারে আটটা বাজে—দেবব্রত কেন এখনও এল না। প্লেন তো অনেকক্ষণ পেঁ।ছে যাবার কথা।

জাফর সেটা লক্ষ্য করে বলল, প্লেনে লেট হতে পারে! একবাজি খেলতে বসুন, দা টাইম উইল পাস কুইকলি।

জাফরের পীড়াপিড়িতে মাধুরীকে খেলতে বসতেই হল শেষ পর্যন্ত, তপতী আর প্রিয়ব্রত পাশে বসে দেখছে। সত্যিকারের একটা প্রতিযোগিতা, এখন দাবা খেলাটা শুধু তার সময় কাটাবার খেলা নয়, রীতিমতন আর্টের পর্যায়ে উঠে গেছে। যেন রাজা-মন্ত্রী-অশ্ব-গজ পদাতিক দিয়ে দু দিকের দুটি সংসার—সামান্য একটু চালে ভুল হলেই এ সংসার ভেঙে যাবে।

মাধুরী খেলার সময় সাধারণত কোন কথা বলে না। অন্য কোন-দিকে চায় না, শুধু ঐ ছকটি দেখে। কিন্তু আজ সে বারবার ঘড়ি দেখছে, মাঝে মাঝেই উৎকর্ণ হয়ে শোনার চেষ্টা করছে গাড়ির আওয়াজ। বাড়ি ফেরার পর থেকেই আজ তার মন চঞ্চল হয়ে আছে।

প্রায় মিনিট পনেরো দুপক্ষই চুপচাপ থাকার পর—মাধুরী তার একটি নৌকা ঠেলে দিল এ প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। তপতী পর্যন্ত আঁতকে উঠল, বৌদি, কি করলে!

জাফর মাধুরীকে জিজ্ঞেস করল, চাল ফেরত নেবেন?

মাধুরী মুখ তুলে বলল, কেন?

জাফর তার মন্ত্রীকে তিন ঘর এগিয়ে দিয়ে বলল, মাত! বুঝেছি, আজ আপনার দিমাগ ঠিক নেই। অন্যদিন আমি হেরে যাই। আজ আপনি এত সহজে—

বাইরে গাড়ির শব্দ হল। সবাই খেলা ছেড়ে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। গাড়িতে ড্রাইভার একা।

গগনেন্দ্র ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞেস করলেন, প্লেন আসে নি?

ড্রাইভার ঘাড় নাড়ল। প্লেন এসেছে, কিন্তু দেবব্রত ফেরে নি।

গগনেন্দ্রর কপালে চিন্তার সিঁড়ি পড়ল। অস্ফুট ভাবে বললেন, আজও এল না! কোন খবরও দিল না—

॥ ২ ॥

দেবব্রত সেদিন বা তার পরের দিনও ফিরল না। কোনরকম খবরও এল না তার কাছ থেকে। দেবব্রতর অফিসেও কোন সন্ধান নেই। দু'দিন অপেক্ষা করার পর গগনেন্দ্রনাথ নিজেই গেলেন বোম্বাইতে। হোটেলে দেবব্রতর জিনিসপত্র সবই পড়ে আছে—দু'দিন আগে সে সকালবেলা বেরিয়ে সন্ধ্যেবেলা ফিরে আসব বলে আর ফেরে নি।

সমস্ত হাসপাতাল ও থানায়ও খোঁজখবর নেওয়া হল। এমন কি মর্গে গিয়ে বহু পচা-গলা মৃতদেহ দেখলেন গগনেন্দ্রনাথ—কিন্তু দেবব্রত কোথাও নেই। গগনেন্দ্রনাথ শক্ত চরিত্রের মানুষ—অজ্ঞান হয়ে গেলেন না বা ভেঙে পড়লেন না—তিনি ধরেই নিলেন, তাঁর ছেলে হঠাৎ কোন কাজে কোথাও গেছে, খবর দেবার সময় পায় নি। কি এমন কাজ হতে পারে—তা অবশ্য বোঝার উপায় নেই—এবং যদিও দেবব্রত সারা জীবনে কখনও এরকমভাবে বিনা খবরে কোথাও যায় নি—তবুও মানুষের জীবনে তো নিত্য নতুন ঘটনা ঘটতেও পারে!

বোম্বাইয়ে গগনেন্দ্রনাথের পরিচিত ব্যক্তির সংখ্যা কম নয়—তাঁরা অনুসন্ধানে যথাসাধ্য সাহায্য করেছিলেন। কেউ কেউ বললেন, হয়তো কোন কারণে দেবব্রতর স্মৃতি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। কিন্তু এটা এমনই গল্পের মতন ঘটনা যে গগনেন্দ্রনাথ বিশ্বাস করলেন না। বোম্বাইয়ে নির্মিত অনেক ফিল্ম এ রকম ঘটনা দেখা যায় বটে কিন্তু জীবনে এসব বিশ্বাসযোগ্য নয়। দিন চারেক বোম্বাইতে থাকার পর তিনি ফিরে এলেন।

এই চারদিন তিনি নিজেও বাড়িতে কোন খবর দেওয়ার সময় পান নি। ফলে বাড়ির লোক যে কত বেশী উদ্বিগ্ন হয়ে থাকবে,

সটাও তার খেয়াল হয় নি। ফিরে এসে যখন বুঝতে পারলেন, তখন তিনি ভাবলেন যে তিনি নিজে যেমন বোম্বাইতে নানা কাজে সব সময় ব্যস্ত থেকে খবর পাঠাবার সময় পান নি—দেবব্রতও নিশ্চয়ই সেই রকমই কোন ব্যাপারে ব্যস্ত রয়েছে। হয়তো কোন বিপন্ন বন্ধুকে সাহায্য করবার জন্য—

হায়দ্রাবাদে ফিরে গগনেন্দ্রনাথ বিশেষ কিছু ভাঙলেন না। শুধু বললেন যে, দেবব্রত বিশেষ কাজে অন্য জায়গায় গেছে—ফিরতে দু'একদিন দেরী হবে। সে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিল কিন্তু ডাকের যোগাযোগে এসে পেঁছিয় নি। বাড়ির সকলের সামনে তিনি একদিন পিওনকে আচ্ছা করে ধমকে দিলেন।

একমাসের মধ্যেও দেবব্রত ফিরে এল না কিংবা কোনও খবরও দিল না। গগনেন্দ্রনাথ আর একবার বোম্বাই ঘুরে এলেন। নতুন কোন সংবাদ নেই। একমাস আগে একদিন সকালবেলা গগনেন্দ্রনাথের একজন পরিচিত ব্যক্তি দেবব্রতকে চার্চগেট-এর কাছে রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলেন—দু'একটা কথাও বলেছিলেন, দেবব্রত তখন খুবই স্বাভাবিক এবং উৎফুল্ল ছিল। তারপর কেউ তাকে দেখেনি। সে যেন পাতলা হাওয়ায় অদৃশ্য হয়ে গেছে।

হায়দ্রাবাদে চৌধুরী পরিবারে দৃশ্যটি এখন কি রকম? সবই আছে, শুধু দেবব্রত নেই—দেবব্রত তো প্রায়ই থাকে না—মাঝখানে বেশ কিছুদিন বিলেতে গিয়েছিল, কিংবা কানপুরে ট্রেনিংয়ে। কিন্তু তখন তার চিঠি আসত—এখন চিঠি আসে না—শুধু এর জন্যেই কত কিছু বদলে যায়।

মন্দাকিনী কান্নাকাটি শুরু করে দিয়েছেন। গগনেন্দ্রের কোন স্তোকবাক্য তিনি আর মানেন না। শেষ পর্যন্ত তিনি নাওয়া-খাওয়া পর্যন্ত ছেড়ে দিলেন। মাধুরীকে দুঃখ ও শোকের চেয়েও একটা অসহ্য বিস্ময়বোধ যেন একেবারে অসাড় করে দিয়েছে। সে কিছুই বুঝতে পারছে না—যত কাজই থাক, দেবব্রত তাকে কোন খবর না

দিয়ে এতদিন বাইরে থাকবে—এটা সে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারে না। কিছুতেই না।

প্রিয়ব্রত আর তপতী একেবারে চুপচাপ হয়ে গেছে। বাড়িতে যতক্ষণ থাকে ওরা একবারও জোরে কথা বলে না। ওরা ছেলেমানুষ, ওদের পক্ষে কিছু করার সাধ্য নেই, অথচ দাদার নিরুদ্দেশ হয়ে যাবার ব্যাপারটা ওরা সহ্যও করতে পারছে না। সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার এই, দেবব্রতর চরিত্রের মধ্যে এতদিন এমন কোন সামান্য চিহ্নও তারা দেখতে পায় নি—যাতে এখন বোঝা যেতে পারে যে কখনো সে এমন কোন কাজ করবে। তাহলে তার কোন বড় রকমের বিপদ হয়েছে? কিন্তু অত বড় একটা মানুষকে তো কেউ জোর করে ধরে রাখতে পারে না। শুধু শুধু তাকে ধরে রাখবেই বা কেন?

গগনেন্দ্রনাথ তাঁর চেহারায় একটা প্রশান্ত গাম্ভীর্য রক্ষা করে চলেছেন। নিয়মিত অফিসে যান। সারা ভারতবর্ষ জুড়ে যেখানে তাঁর যত বন্ধুবান্ধব বা পরিচিত লোক আছে—প্রত্যেকের কাছে খবর পাঠিয়েছেন দেবব্রতর খোঁজ করার জন্য, পুলিশ বিভাগকে সক্রিয় করে তুলেছেন। দেবব্রতর বন্ধু জাফরের সঙ্গে উঁচু মহলের যোগাযোগ আছে। সে তার বন্ধুকে খুঁজে বার করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছে। কিন্তু দেবব্রত কোথাও নেই।

বাড়িতে অনুপস্থিত দেবব্রতর চেয়েও বেশী চিন্তার কারণ হয়ে উঠলেন মন্দাকিনী। তিনি স্নানাহার বন্ধ করায় সবাই এখন তাঁকে নিয়ে বেশী ব্যস্ত। মন্দাকিনীকে কিছুতেই টলানো যায় না—তিনি জেদ ধরেছেন যে দেবব্রতর খোঁজ না পাওয়া পর্যন্ত তিনি কোন খাবার মুখে তুলবেন না। নানারকম মিথ্যে সান্ত্বনাবাক্য তাঁকে শুনিয়েও কোন ফল পাওয়া যায় না। সন্তানের মৃত্যুসংবাদ পেলেও তো মায়েরা অধিকাংশ সময় সামলে ওঠেন। কিন্তু এটা যে অন্যরকম।

কয়েকদিন না খেয়ে থাকার ফলে মন্দাকিনীর একটা ছোটখাটো হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেল। হাসপাতালে পাঠাতে হল তাঁকে। তিন-

চারদিন সবাইকে গভীর উদ্বেগের মধ্যে রেখে তিনি আবার সুস্থ হয়ে উঠলেন। হাসপাতালের পরিচর্যাতেই তিনি সেবার বেঁচে উঠলেন বলা যায়। বাড়িতে ফিরিয়ে আনার পর তাঁকে অনেকটা শান্ত মনে হল। শরীর অসুস্থ থাকলে শরীরের জন্যই অনেকখানি চিন্তা থাকে—অন্য চিন্তা তেমন প্রবল হতে পারে না।

তিনমাস কেটে গেছে। এর মধ্যেও দেবব্রতর মৃতদেহ পাওয়া যায় নি বলে তার মৃত্যুর সম্ভাবনার কথা কেউ উল্লেখ করে না। সবাই ধরে নিয়েছে, কোন একটা অনির্দিষ্ট কারণে দেবব্রত বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারছে না। অনেকেই বলছে যে সে সন্ন্যাসী হয়ে গেছে—যদিও তার চরিত্রের সঙ্গে এটা একেবারেই মেলে না। ঠাকুর-দেবতা বা ধর্মের প্রতি তার কখনো টান ছিল না—এমনিতেই সে দয়ালু স্বভাবের, মানুষের দুঃখ-কষ্ট দেখলে দুর্বল হয়ে যায়—কিন্তু ভাগ্য কিংবা নিয়তি মানে না।

ভারতের নানা প্রান্তে সংবাদ-সংগ্রাহকরা নানারকম গুজব পাঠাতে লাগল। কেউ বলল তাকে হরিদ্বারে দেখা গেছে, কেউ বলল সেতু-বন্ধ-রামেশ্বরে, কেউ বলল, গোয়ায় গিয়ে সে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে জেলখানায় আছে। অনর্থক কয়েকবার ছুটোছুটি করতে হল গগনেন্দ্রকে। তারপর তিনিও হাল ছেড়ে দিলেন। শুধু রইল প্রতিনিয়ত প্রতীক্ষা—দেবব্রত যে-কোন দিন ফিরে আসবে।

যে সুখী পরিবারটিকে আমরা প্রথমে দেখেছি, একটি মাত্র দাবার ঘুঁটি সরিয়ে নেওয়ায় তার কী কী পরিবর্তন হল দেখা যাক।

প্রথমেই স্বাস্থ্যভঙ্গ হল প্রৌঢ় দুজনের। মন্দাকিনীকে দেখলেই বোঝা যায়, তিনি আর কোনদিনই সুস্থ-সমর্থ হয়ে উঠবেন না। অধিকাংশ সময়েই শয্যাশায়ী। যদিও নিজের খাওয়া-বাথরুম যাওয়ার ব্যাপারে অন্যের সাহায্যের এখন দরকার হয় না।

গগনেন্দ্রকে বাইরে থেকে কিছু বোঝা যায় না—শুধু তাঁর মুখে হঠাৎ বয়েসের ছাপ পড়েছে। এতকাল তাঁর দীর্ঘ ঋজু চেহারা দেখে

কিছুই বোঝা যেত না। শরীরে তেমন কোন রোগও ছিল না—কিন্তু এই সময় চাপা চিন্তা-ভাবনায় গগনেন্দ্রনাথ একই সঙ্গে ব্লাডপ্রেসার ও ডায়াবেটিস-এ আক্রান্ত হলেন। বাড়িতে সে কথা কারুকে জানালেন না।

তপতীর বিয়ে ঠিক হয়েছিল জব্বলপুরের এক পাত্রের সঙ্গে, বলাই বাহুল্য, সে বিয়ে পেছিয়ে গেল। ইতিমধ্যে তপতী অন্য একটা পরিকল্পনা করেছিল। দাদার বন্ধু জাফরের সঙ্গে তার কিছুটা হৃদয়-বিনিময় হয়ে গিয়েছিল। পরস্পর পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত—যদিও কেউই প্রকাশ্যে সে কথাটা বলেনি। দু'জনে দু'জনের চোখের দিকে গাঢ় ভাবে তাকিয়ে হৃদয়ের সংবাদ বুঝে নিয়েছে। পাত্র হিসেবে জাফর অতিমাত্রায় যোগ্য, সে যেমনি রূপবান, তেমনি ভদ্র ও শিক্ষিত—একমাত্র বাধা হচ্ছে জাতের প্রশ্ন। বাধা দু-পক্ষ থেকেই। জাফরদের বনেদী বংশ—অন্য জাতের মেয়েকে বিয়ে করলে তার পরি-বারের লোক কিছুতেই সমর্থন করবে না। কিন্তু জাফর পুরুষ মানুষ, সে এই বাধা অতিক্রম করলেও করতে পারে। তপতী জানে তার বাবা-মা তেমন রক্ষণশীল না, আবার এতটা উদারও নয় যে এ-রকম বিয়ে মেনে নিতে পারবে। বাবাকে কোনরকমে বোঝানো গেলেও মা-কে কিছুতেই শান্ত করা যাবে না। তপতী ছটফটে স্বভাবের মেয়ে, সে ঠিক করে রেখেছিল—বাবা সম্পূর্ণ বাধা না দিলে সে জোর করে বেরিয়ে গিয়ে জাফরকে বিয়ে করতেও রাজী। সে এই সব জাতের বন্ধন ভাঙতে চায়। কিন্তু দেবব্রত নিরুদ্দেশ হওয়ায় সবকিছু ওলট-পালট হয়ে গেল। এখন বাবা-মাকে তার পক্ষ থেকে আঘাত দেওয়া মানে—তাদের মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া। মা-কে কিছুতেই বাঁচানো যাবে না। তপতী কি তা পারে? মা-বাবার জীবনের বিনিময়ে তো সে প্রগতি সমর্থন করতে পারে না। তপতী ঠিক করল, তাকে আত্মত্যাগ স্বীকার করতেই হবে। তপতী জাফরের সঙ্গে মেলামেশা একেবারে বন্ধ করে দিল।

প্রিয়ব্রত কিশোর জীবনে তার দাদাই ছিল তার কাছে আদর্শ। জীবনের সার্থকতার মানে বুঝত সে দাদার মতন হওয়া। এখন দাদার আকস্মিক অনুপস্থিতে তার চোখের সামনেটা শূন্য হয়ে গেল। দিনরাত দাদার কথা ভাবে। এক এক সময় ঠিক করে যে সে-ও বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে দাদাকে খুঁজে আনবে। সে গেলে দাদাকে ঠিক খুঁজে পাবেই। পড়াশুনোয় বেশ ভাল ছাত্র ছিল প্রিয়ব্রত। সে বছর স্কুলের পরীক্ষায় অনেক খারাপ ফল হল।

এরই মধ্যে এক সময় জানা গেল, মাধবী অন্তঃসত্ত্বা। এর মধ্যে এলাহাবাদ থেকে মাধুরীর দাদা সুবিমল একবার দেখা করে গেছে। মাধুরীর এই অবস্থার কথা শুনে তাকে জোর করে এলাহাবাদে নিয়ে গেল। সুবিমলের ব্যবহার একটু রুক্ষ ধরনের। তার কথাবার্তা শুনে বোঝা গেল যে দেবব্রত ফিরে না এলে আর মাধুরীকে এখানে পাঠানো হবে না। গগনেন্দ্রনাথ নীচু গলায় কি যেন বলতে গেলেন, সুবিমল কানেই তুলল না। মাধুরী মুখ নীচু করে রইল—যেন এ বিষয়ে তার কোন মতামতই নেই।

এলাহাবাদে মাধুরীর শৈশব ও কৈশোর কেটেছে। তার মধুর স্মৃতির এলাহাবাদ। কিন্তু এবার তার সব কিছুই দুঃসহ মনে হতে লাগল। এখানকার কত মানুষ তার চেনা, কিন্তু বাড়ি ছেড়ে সে কোথাও যায় না। সব সময় তার মনে হয়, লোকে তার দিকে অদ্ভুত ভাবে তাকাচ্ছে। তার স্বামী নিরুদ্দিষ্ট—এটা যেন তারই অপরাধ। শ্বশুরবাড়ি থাকার সময় সে দুঃখটা সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিতে পারত—তাকে আলাদা ভাবে সান্ত্বনা দেবার কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু এখানে সকলে তাকে সান্ত্বনা জানাতে আসে—যেটা এতই ফাঁপা ও অর্থহীন যে কানে না লেগে পারে না। কেউ কেউ আবার দেবব্রতর চরিত্র সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে। এটা আরও অসহ্য।

মাধুরীর বাবা বেঁচে নেই। তার তিন দাদা ছড়িয়ে আছে ভারতবর্ষের তিন প্রান্তে, এক দিদি বিয়ের পর থেকেই স্বামীর সঙ্গে

থাকে আফ্রিকায়। সুবিমল আর তার স্ত্রী দুজনেই এখানকার কলেজে পড়ায় এবং ক্লাব ও রাজনীতি নিয়ে খুব ব্যস্ত থাকে। বাড়িতে কথা বলার মধ্যে আছে শুধু তার মা। মা শুধু তাঁর নিজের ভাগ্যকে দোষ দেন। কত দেখে-শুনে অমন গুণবান জামাই এনেছিলেন—সেই জামাইয়ের যে এরকম হবে কে জানত। এরকম মানে কি রকম? সেটাই যে কেউ বুঝে উঠতে পারে না।

মাধুরীর সন্তান জন্মাবার দিন দুয়েক আগে একটা চিঠি এল তার নামে। চিঠিখানায় কোন ঠিকানা নেই—ডাকঘরের ছাপ আছে আলমোড়া। একটা খুব পুরোনো হলদেটে কাগজে বড় বড় গোটা অক্ষরে লেখা, 'মাধুরী, আমি সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করেছি। সংসারে আর আমার মন নেই। কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত আমি ফিরব না। তোমরা সুখে থেকো। নবজাতককে আমার আশীর্বাদ দিও। ইতি দেবব্রত।'

চিঠিখানা পড়ে মাধুরী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। মাধুরীর শরীরে তখন পায়াণভার, শুয়ে ছিল বিছানায়—চিঠিখানা আসায় একটুও চাঞ্চল্য এল না—ঠোঁটের কোণায় একটু ক্লিষ্ট হাসি ফুটে উঠল। শান্ত স্বভাবের মেয়ে হলেও মাধুরী খুবই বুদ্ধিমতী। এ চিঠি যে দেবব্রত লেখেনি—একথা বুঝতে তার এক মুহূর্তও দেরী হল না! হাতের লেখা গোপন করার জন্য বড় বড় অক্ষরে লেখা হয়েছে। এই সঙ্কটজনক সময় মাধুরীর মনে খানিকটা শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য কেউ লিখেছে এটা। তার যে সন্তান জন্মাবে—তার বাবা যে বেঁচে আছে, এটুকু জানাও তো বিরাট সান্ত্বনা।

কে লিখেছে ঐ চিঠি? মাধুরী অনুমান করল, প্রিয়ব্রত কিংবা জাফর। প্রিয়ব্রতর ছেলেমানুষী বুদ্ধিতেই একথা মনে জাগা সম্ভব। কিংবা জাফর—দেবব্রতকে সে সত্যিই ভালোবাসে। এমনও হতে পারে, জাফরের পরিকল্পনায় প্রিয়ব্রতকে দিয়ে লেখান হয়েছে তারপর অন্য কারুকে দিয়ে আলমোড়া থেকে পোস্ট করানো এমন কিছু

অসম্ভব ব্যাপার নয়।

চিঠিখানা নিয়ে কি করবে—তাই নিয়ে মাধুরী দু-এক মুহূর্ত ভাবল। বাড়ির অন্য কারুকে কি দেখানো উচিত? তারা যদি বিশ্বাস করে বসে? দাদা নিশ্চয়ই আলমোড়ায় গিয়ে খোঁজ করার চেষ্টা করবে। শুধু শুধু টাকাপয়সা নষ্ট। এর আগেও এরকম হয়েছে কয়েকবার।

অন্য কোন মেয়ে হলে নিশ্চয়ই একবার অন্তত সন্দেহের দোলায় দুলত। হতেও তো পারে চিঠিখানা সত্যিই দেবব্রত লিখেছে। মাধুরী কিন্তু এরকম দুর্বলতা একটু স্থান দিল না মনে। সে জানে, একমাত্র সে-ই জানে, দেবব্রত তাকে কোন ভাষায় চিঠি লিখবে। দ্বিধা না করে মাধুরী চিঠিখানি ছিঁড়ে ফেলল কুচি কুচি করে। অন্য কারুর চোখে পড়ার দরকার নেই।

যথাসময়ে মাধুরী একটি পুত্রসন্তান জন্ম দিল। ফুটফুটে সুন্দর চেহারা, তবে তার ওজন মাত্র পাঁচ পাউণ্ড। সুবিমল মন্তব্য করলেন, তাতে কি হয়েছে। জন্মের সময় নেপোলিয়নও ঐ টুকুনি ছোট্ট ছিল। আগের রাত্রে গগনেন্দ্র এসেছেন প্রিয়ব্রতকে সঙ্গে নিয়ে। গগনেন্দ্র গিনি দিয়ে নাতির মুখ দেখলেন। অনেকক্ষণ চেয়ে রইলেন শিশুটির দিকে। তাঁর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে এল। একটি শিশু এসেছে এই পৃথিবীতে, তার জন্য কেউ প্রাণ খুলে আনন্দ করতে পারছে না।

মাধুরী হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফেরার পর গগনেন্দ্র ফিরে গেলেন হায়দ্রাবাদে। প্রিয়ব্রত থেকে গেল—পরীক্ষা হয়ে গেছে, তার স্কুল ছুটি। সে সব সময় বৌদির কাছাকাছি থাকে, বাচ্চাটাকে হাসাবার চেষ্টা করে। ডিকশনারি দেখে সে একশো দশটা নামের লিস্ট বানিয়েছে বাচ্চাটার জন্য। কোনটাই মাধুরীর পছন্দ হয় না।

মাসখানেকের মধ্যে বাচ্চাটা এত প্রাণচাঞ্চল্য দেখাতে লাগল যে প্রিয়ব্রত আর মাধুরী ওকে নিয়েই ব্যস্ত থাকে সারাক্ষণ। দেবব্রতর

অনুপস্থিতির কালো ছায়াটা এখন আর চোখে পড়ে না। মাধুরী প্রিয়ব্রতকে সেই চিঠিটার কথাও বলে নি। যদিও প্রিয়ব্রতর উৎসুক মুখ দেখে তার মনের বিশ্বাসটা দৃঢ় হয়েছে যে প্রিয়ব্রত ঐ চিঠির কথা জানে। সে নিজেই একবার বলেছিল, বৌদি, যে-যাই বলুক, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, দাদা বেঁচে আছে। ঠিক বেঁচে আছে।

মাধুরী হেসে বলেছিল, ঠিক আছে, তুই আর একটু বড় হ—তারপর তোর দাদাকে খুঁজে আনিস।

—আনবই তো। তুমি দেখো, দাদা যেখানেই থাক—একদিন ঠিক তোমার সামনে এনে হাজির করব।

—তোর দাদা যদি আসতে না চায়, তা-ও নিয়ে আসবি?

—তার মানে?

মাধুরী আর কিছু বলে নি।

বাচ্চাটার ডাক নাম হয়েছে সুন্টিসোনা। ঐ নামে ডাকলেই সে জুল জুল করে তাকায় আর ফোকলা দাঁতে হাসে। মাথায় বেশী চুল নেই, চোখ দুটি বেশ টানা টানা—গায়ের রংয়ের লালচে ভাবটা কেটে গিয়ে ফর্সা রং বেরিয়ে আসছে। কেউ বলে তাকে দেবব্রতর মতন দেখতে হয়েছে—কেউ বলে অবিকল মাধুরীর মতন। প্রিয়ব্রতর দৃঢ় ধারণা তার দাদার সঙ্গেই সুন্টিসোনার মিল বেশী।

মাধুরী হাঁটা চলা শুরু করার পর প্রিয়ব্রতর সঙ্গে মাঝে মাঝে বাগানে বেড়াতে যায়। তাদের বাড়ির সামনেই ছোট্ট একটি বাগান আছে। বেশ শীত—দুজনের গায়েই ভাল করে শাল জড়ানো, মাধুরীর কোলে বাচ্চাটা গরম জামায় মোড়া। শিরশির করছে হাওয়া, এক্ষুনি বিকেল শেষ হবে। প্রিয়ব্রত অনেক কথা বলে যাচ্ছিল, মাধুরী বাধা দিয়ে বললে, তোর তো এবার স্কুল খুলবে, তোকে চলে যেতে হবে।

—আমি এই শনিবার যাব।

—আবার কবে তোর সঙ্গে দেখা হবে কে জানে। মাঝে মাঝে আসবি তো? একলা আসতে পারবি?

প্রিয়ব্রত অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, তুমি যাবে না?

মাধুরী অন্যমনস্কভাবে বলল, আমি? আমার কি আর যাওয়া হবে?

—বাঃ, তুমি এখানেই থাকবে নাকি? চার-পাঁচ মাস বাদেই তোমাকে আসতে হবে।

—আমি গিয়ে কি করব বল্ তো?

—বাঃ, ওটাই তো তোমার বাড়ি। এটা তোমার বাড়ি নাকি? এটাতো তোমার দাদার বাড়ি।

মাধুরী সেই সরল কিশোরের দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত ভাবে হাসল। কিছুদিন ধরেই মাধুরী এই কথাটা ভাবছে। দেবব্রত যদি আর কোনদিনই ফিরে না আসে—তাহলে সে কোথায় থাকবে? স্বামী ছাড়া শ্বশুরবাড়িতে থাকা কি তার মানায়? এদিকে দাদার বাড়িতেই বা সে চিরকাল থাকবে কি করে? দাদা কোনদিন আপত্তি করবে না—কিন্তু···! তাছাড়া এখন আর সে একা নয়, এখন তার ছেলেকে মানুষ করে তোলার দায়িত্ব আছে। মাধুরী খুব ভালভাবেই জানে, তার শ্বশুর গগনেন্দ্রনাথ তাকে হায়দ্রাবাদে নিয়ে যেতে চাইবেনই। তার নিজের জন্য না হলেও নাতির সাহচর্যে সান্ত্বনা পাবার জন্য। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, মাধুরীর পক্ষে ঠিক কোথায় থাকা উচিত? সে দেখেছে, অল্পবয়েসী বিধবারা শ্বশুরবাড়িতে না থেকে বাপের বাড়িতেই থাকে। যদিও মাধুরী বিধবা নয়, কিংবা সে জানে না সে বিধবা কি না। সে মাছ-মাংস খায়, রঙীন শাড়ি পরে। এর চেয়ে বিধবা হলেও তার অবস্থা অনেক সরল হত। মাধুরী বুঝতেও পারে না, কার সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করবে। প্রিয়ব্রত বড্ড ছেলেমানুষ—সে এ সব কি বুঝবে।

—প্রিয়ব্রত যাবার ঠিক আগের দিন সন্ধ্যেবেলা দোতলার

বারান্দায় বসে মাধুরী তার ছেলেকে ফিডিং বটলে দুধ খাওয়াচ্ছিল। মাধুরীর মা আর প্রিয়ব্রতও সেখানে রয়েছে—মাধুরীর মা শোনাচ্ছিলেন ভাওয়াল সন্ন্যাসীর কাহিনী। এমন সময় সন্টিসোনা দু'বার হেঁচকি তুলে চোখ বিস্তারিত করল। তার হাত-পা যেন বেঁকে যাচ্ছে, কাঁদবার চেষ্টা করেও কাঁদতে পারছে না।

কি হল, বলে মাধুরীর মা ছুটে এলেন। বাচ্চাটাকে ছোঁ মেরে কোলে তুলে নিয়ে পিঠে চাপড় মারতে মারতে বললেন, দম আটকে গেছে গো! বিষম খেয়েছে!

মাধুরী উঠে দাঁড়িয়ে বিদ্যুতের মতন প্রিয়ব্রতর দিকে ঘুরে বলল, ডাক্তার! শিগ্গির—

মা বললেন, ডাক্তার ডাকতে হবে না। এক্ষুণি ঠিক হয়ে যাবে। বাচ্চাদের এরকম হয়।

মাধুরী সে কথায় ভ্রূক্ষেপ করল না। আবার প্রিয়ব্রতকে বলল, শিগ্গির ডাক্তার ডাক।

প্রিয়ব্রতর শুধু গেঞ্জি-গায়ে ছিল। সেই অবস্থাতেই দৌড়ে নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে। কাছেই একজন ডাক্তার থাকেন—এ পরিবারের সঙ্গে খুব চেনা।

প্রিয়ব্রত যখন ডাঃ সাকসেনাকে ডেকে নিয়ে এল, তখন মাধুরী তার ছেলেকে কোলে শুইয়ে পাথরের মূর্তির মতন বসে আছে, তার মা গরম জলের সেঁক দিচ্ছেন শিশুটির পায়ে। কোথাও কোন শব্দ নেই।

ডাঃ সাকসেনা দু'-এক পলক থমকে দাঁড়ালেন। মা ও ছেলেকে দেখলেন একসঙ্গে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তারপর এগিয়ে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে ছেলের গায়ে হাত দিলেন। কিন্তু তাকিয়ে আছেন মাধুরীর চোখের দিকে।

মাধুরী কোন প্রশ্নই করল না। ডাক্তার তখন মাধুরীর মায়ের দিকে ফিরে বললেন, জন্ম থেকেই ওর স্বাস্থ্য খারাপ ছিল। চেষ্টা

করেও ওকে বাঁচানো যেত না। অনেকক্ষণ মারা গেছে।

জোর গলায় কান্না শোনা গেল শুধু মাধুরীর মায়ের! প্রিয়ব্রত কান্না দমন করার জন্য ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ধরল। মাধুরী নিস্পন্দ। অদ্ভুত উদাসীন চোখে সে তাকিয়ে আছে দেয়ালের দিকে, ছেলেকেও আর দেখছে না। নিদারুণ শোকের দৃশ্য, তবু একটি কথা এখানে না বলে উপায় নেই—মাধুরীকে তখন অসম্ভব সুন্দর দেখাচ্ছিল। যাকে বলে শিল্পের সৌন্দর্য। প্রিয়ব্রত বিস্ফারিত চোখে দেখছিল।

মাধুরী সেই রকমভাবেই বসে রইল ছেলে কোলে নিয়ে। সুবিমল আর তার স্ত্রী খবর পেয়ে বাড়িতে চলে এল। এল অনেক মানুষ। মাধুরী কাঁদল না, কারুর কথাও শুনল না। এক সময় তার কোল থেকে বাচ্চাটিকে তুলে নেওয়া হল। প্রিয়ব্রত মাধুরীর বাহু ধরে অনুনয় করে বলল, বৌদি, ওঠো!

ঘোর-লাগা মানুষের মতন মাধুরী উঠে দাঁড়াল। তারপর ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল বিছানায়।

রাত অনেক বেড়েছে, অন্যান্যদের শোক-উচ্ছ্বাস কমে এসেছে। ঐটুকু শিশুর মড়াকে সারা রাত বাড়িতে রাখার কোন মানে হয় না। সুবিমল তাকে কোলে তুলে নিয়ে চলল গোরস্থানের দিকে। নতুন করে কান্না শুরু করলেন মাধুরীর মা। অনেক দূর পর্যন্ত সেই বুক খালি করা কান্না শোনা গেল। মাধুরী বোধ হয় ততক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে।

গোরস্থানে পাঁচ ছ'জন মাত্র মানুষ। অল্পক্ষণেই শিশুটিকে সমাধিস্থ করা হয়ে গেল। কিছুক্ষণ আগেও যে বেঁচেছিল, মায়ের আদর কেড়েছিল, সে এখন আর নেই। সে চলে গেল মাটির নিচে। ঠান্ডা অন্ধকারে তাকে একা ফেলে রেখে যেতে হবে। প্রিয়ব্রতই মাটি চাপা দিল। হাত দিয়ে প্রেস করে দিল মাটি। অনেকক্ষণ ধরে হাত বুলোচ্ছিল—সুবিমল বলল, ওঠো এবার। কেন যে এরা কষ্ট দিতে পৃথিবীতে আসে।

মধ্যরাত্রে নির্জন রাস্তা দিয়ে ওরা পায়ে হেঁটে বাড়ি ফিরল। চাঁদের আলোয় ধুয়ে যাচ্ছে পৃথিবী। মনে হয়, চতুর্দিকে আশ্চর্য শান্তি ছড়ানো। কত বাড়িতে ঘুমন্ত মানুষ আজ সুখ-স্বপ্ন দেখছে। শুধু ওরা ফিরে আসছে এক শিশুকে মাটির তলায় নির্বাসন দিয়ে।

সদর দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে আছে মাধুরী। তার চুল খোলা, চোখের দৃষ্টি উদভ্রান্ত।

সুবিমল তাকে দেখে উৎকণ্ঠিত হয়ে বলল, এ কি, তুই নিচে নেমে এসেছিস কেন? চল চল।

এই প্রথম কান্নায় ভেঙে পড়ল মাধুরী। প্রিয়ব্রতর হাত দুটো চেপে ধরে আকুল গলায় বলল প্রিয়, প্রিয়, ওকে ফিরিয়ে এনে দে! ওকে ফিরিয়ে এনে দে! আমি আর পারছি না—!

প্রিয়ব্রতর কিশোর হৃদয় দুলে দুলে উঠতে লাগল। সে ঠিক বুঝতে পারল না—বৌদি কাকে এনে দেবার কথা বলছে। তার স্বামীকে, না তার সন্তানকে?

॥ ৩ ॥

শোক থেকে অসুখ। কঠিন অসুখে ভুগে ভুগে মাধুরী প্রায় মরতে বসেছিল। কিংবা নিজেই হয়তো সে মরতে চেয়েছিল—সেই মৃত্যুবাসনা তার রোগকে আরও তীব্র করে তোলে। বেশ কিছুদিন ধরে সে সম্পূর্ণ শয্যাশায়ী, তার সোনার অঙ্গে কালি পড়েছে, খুব রোগা ছোট্ট হয়ে গেছে চেহারাটা। তাকে ভাল করে চেনাই যায় না।

সেই সময় গগনেন্দ্রনাথ আবার এলেন এলাহাবাদে। নিজের চোখে মাধুরীর অবস্থা দেখে কারুর কোন যুক্তি বা পরামর্শ শুনলেন না। জোর করে তাকে নিয়ে এলেন হায়দ্রাবাদে। সুবিমলকে

বললেন, আর কিছু না হোক, মেয়েটার অন্তত একটু হাওয়া বদল তো হবে। এখানে থাকলে তো মেয়েটা নিশ্চিত মরে যাবে।

মাধুরীর মা-ও শেষ পর্যন্ত আপত্তি করলেন না। তিনিও যেন আস্তে আস্তে তাঁর মেয়ের জীবনের আশা ছেড়ে দিচ্ছিলেন এবং ধরেই নিয়েছিলেন এ সবই নিয়তি।

অতখানি অসুস্থ অবস্থায় মাধুরীকে এক জায়গায় নিয়ে যাওয়ার বেশ ঝুঁকি ছিল। গগনেন্দ্রনাথ সেই ঝুঁকি নিতেও দ্বিধা করলেন না। একটি স্টেশন-ওয়াগন ভাড়া করলেন এবং সঙ্গে নিয়ে এলেন একজন নার্স। হায়দ্রাবাদে পেঁছে যখন মাধুরীকে নামানো হল, তখন তাকে দেখে মনে হয়, সে যেন স্বামীগৃহে শেষ নিশ্বাস ফেলতে এসেছে।

সপ্তাহখানেক বাদে মাধুরীর অবস্থার পরিবর্তন দেখা গেল। সে সেরে উঠতে লাগল আস্তে আস্তে। প্রিয়ব্রত আর তপতী তার সেবা করল প্রাণ দিয়ে। ওরা যেন মনে মনে একটা প্রতিজ্ঞা করে ফেলেছে, সারা জীবন ওরা বৌদিকে কোন কষ্ট পেতে দেবে না। মাধুরীর মতন এরকম নরম, সুন্দর মানুষ—এতটা দুঃখ-কষ্ট পাওয়া তাকে মানায় না।

মাধুরী আবার উঠে দাঁড়িয়েছে, হাঁটা-চলা করতে পারে। সন্ধ্যেবেলা দাবা খেলে। জাফর আসে, গল্প-আড্ডা হয়। মাঝে মাঝে হাসির আওয়াজও শোনা যায় এখন এ বাড়িতে। দেবব্রতর নাম কেউ আর উচ্চারণ করে না।

অথচ এখনো আলনায় দেবব্রতর জামা ঝুলছে, তার টুথব্রাস, দাড়ি কামাবার সরঞ্জাম সবই সাজানো আছে আগের জায়গায়। বাইরে যাবার সময় দেবব্রত আলাদা সেট নিয়ে যেত। দেবব্রতর চিঠিপত্র ফিতে দিয়ে বেঁধে রাখা আছে আলমারিতে। মাধুরীর বিছানায় এখনো পাশাপাশি দুটো বালিশ পাতা হয়—অতিরিক্ত বালিশটা সরিয়ে নেবার কথা কেউ ভাবে নি।

মাধুরী যখন সম্পূর্ণ সেরে উঠেছে, ফিরে পেয়েছে আগেকার স্বাস্থ্য তখন জাফর একদিন বলল, চলুন ভাবী এবার একবার পিকনিকে যাই। প্রিয়ব্রত আর তপতী লাফিয়ে উঠল, এমন চ্যাঁচামেচি শুরু করে দিল যে মাধুরী আপত্তি করার সুযোগই পেল না।

দেবব্রত নিরুদ্দেশ হবার এক বছর পর, মাধুরীর সন্তান মারা যাবার সাড়ে তিনমাস পর—ওরা আবার পিকনিকে গেল। ঠিক আগের বারের মতন। তবে, এবার মন্দাকিনী যেতে রাজী হলেন না। গগনেন্দ্রর যাবার কথা ছিল, কিন্তু শেষ মুহূর্তে কাজে আটকে গেলেন। তাতে পিকনিক বন্ধ হল না—গগনেন্দ্র বরং ওদের যাবার জন্য নিজেই বেশী করে তাড়া দিতে লাগলেন।

সেদিনও একটা সুন্দর দিন, সেই আগের মতন, কিন্তু সুখের চেহারা এখন অন্যরকম।

হোসেন সাগর নামে যে বিরাট জলাশয় আছে, আজকের পিকনিক সেখানে। জাফর একটা লঞ্চ জোগাড় করেছে। ঝকমকে নীল আকাশের নিচে গভীর উত্তাল জল, লঞ্চটা সারসের মতন তর তর করে এগুচ্ছে। মাধুরীর মুখখানা কখনো কখনো বিষণ্ন হয়ে গেলেও আবার আনন্দের রশ্মি ফুটে উঠছে। প্রকৃতির এই উজ্জ্বল সৌন্দর্যের কাছে এসে কিছুতেই সব সময় বিষণ্ন থাকা যায় না। তাছাড়া জাফর মাঝে মাঝেই কৌতুকের ফোয়ারা ছোটাচ্ছে। বেশ ভাল বাংলা শিখেছে সে। কথায় কথায় রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করে।

এক সময় জাফর জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা ভাবী, আপনাদের হিন্দুদের কি নিয়ম আছে? স্বামীর যদি ট্রেস না পাওয়া যায়—তবে কতদিন অপেক্ষা করতে হয়?

মাধুরী ফ্যাকাসে ভাবে হেসে বলল, আমি জানি না।

তপতী বলল, বারো বছর।

জাফর বলল, ওরে বাবা! এ বড় নিষ্ঠুর নিয়ম! বারো

বছর কষ্ট পেতে হবে?

মাধুরী বলল, আমি তো কষ্ট পাচ্ছি না।

—যদি মরে যায়, কেউ জানতে না পারে?

প্রিয়ব্রত জোর গলায় বলল, দাদা মরেনি, কিছুতেই মরেনি।

জাফর তার দিকে হেসে তাকিয়ে বলল, কথার কথা বলছি। যদি ধরো মরে যায়—

তপতী বলল, সেটা জানতে পারলে কিছুই হবে না।

—দেবটা বড্ড নিমকহারাম! আরে বাবা যদি মরেই গেলি, একটা চিহ্ন রেখে যেতে পারলি না?

প্রিয়ব্রত আবার বলল, দাদা মরে নি।

জাফর তার কাঁধে হাত রেখে বলল, তুমি ঠিক বলেছ প্রিয়। আমারও তাই মনে হয়। আমার সব সময় মনে হয়, তোমার দাদার সঙ্গে যখন তখন দেখা হয়ে যাবে। এমন কি এক্ষুনিও দেখা হয়ে যেতে পারে। ঐ যে নৌকাটাতে একজন বসে আছে—ওকে ঠিক দেবের মতন দেখতে না? ও দেব হতে পারে না?

সবাই সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় ঘুরিয়ে উদগ্রীব হয়ে সেদিকে তাকাল। কাছেই একটা নৌকোয় একজন যুবক ওদের দিকে পিছন ফিরে বসে আখ চিবোচ্ছে—আর ছিবড়েগুলো ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলছে জলে।

প্রিয়ব্রত বলল, যাঃ! আমার দাদার মোটেই অত কম চুল নয়। ওর তো প্রায় টাক পড়ে গেছে।

—মানুষ তো বদলে যায়!

তপতী বলল, দাদা এখানে এসেও আমাদের সঙ্গে দেখা না করে দূরে থাকবে, তা কখনো হয়? কেনই বা সে রকম করবে?

জাফর বললো, কিন্তু এই রকম হঠাৎ আবার দেবের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে দারুণ ব্যাপার হতো না!

প্রিয়ব্রত বললো, দাদাকে যখন প্রথম আবার দেখবো, তখন আমি কি যে করবো—

মাধুরী আস্তে আস্তে বলল, ওরকম ঘটনা নভেল নাটকেই ঘটে।

জাফর মাধুরীর দিকে চেয়ে বলল, ভাবী, আপনি ঠিক করে বলুন তো আপনার কি মনে হয়, ও সত্যিই বেঁচে আছে?

মাধুরী জলের দিকে চোখ রেখে বলল, আমি কি করে বলব!

আপনার ইনটুইশান কি বলে?

কিছুদিন আগে আমি আলমোড়া থেকে একটা চিঠি পেয়েছিলাম।

তপতী চমকে উঠে বলল, সত্যি? এতদিন বল নি তো।

—আমি জানি চিঠিটা ওর লেখা নয়।

জাফর আর প্রিয়ব্রত চোখাচোখি করল। জাফর বলল, এখন আর গোপন করার দরকার নেই। ওটা প্রিয়ব্রত লিখেছে। আমি ওকে বলেছিলাম।

আমি জানতাম।

প্রিয়ব্রত একটু অপ্রস্তুতভাবে বলল, বৌদি, ঐ চিঠিটা লেখা কি আমার অন্যায় হয়েছিল?

—না। আমি ঠিক বুঝেছিলাম।

জাফর আবার বলল, ভাবী, আপনি সত্যি করে বলুন, আপনার কি ধারণা? এটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট! আপনি স্ত্রী, আপনার মন ঠিক জানবে!

মাধুরী খুব আস্তে আস্তে বলল, আমার ধারণা ও বেঁচে নেই।

প্রিয়ব্রত বলল, বৌদি কি বলছ! তা হতেই পারে না।

ও যদি বেঁচে থাকত, তাহলে যেখানেই থাক—আমাকে চিঠি না লেখার ও কোন কারণই নেই। আমি তো ওর সঙ্গে ঝগড়া করি নি।

হয়তো কেউ জোর করে আটকে রেখেছে।

এক বছর ধরে? বিশ্বাস হয় তোর?

—কিংবা ধর, কোন কারণে যদি স্মৃতি নষ্ট হয়ে যায়

—সেরকম গল্পে হয়। সত্যি সত্যি কি কখনো হয়?

—হতেও তো পারে। পৃথিবীতে কত কিছুই তো হয়।

—আমরা আগে সেরকম কথা কখনো শুনিনি।

জাফর বলল, আচ্ছা ধরা যাক, সত্যিই যদি দেবের মেমারি নষ্ট হয়ে যায়—সেই অবস্থায় আমরা তাকে খুঁজে পাই—তখন কি হবে?

প্রিয়ব্রত জিজ্ঞেস করল, কি হবে মানে?

—তাকে কি একরকম ভাবেই মেনে নিতে পারবে? শরীরটা কি মানুষ, না তার স্মৃতিটাই মানুষ? মেমারি না থাকলে শুধু তার চেহারাটাই চিনব—কিন্তু তখন তো সে আর আমার বন্ধু, তোমার দাদা, কিংবা ভাবীজীর হাসব্যান্ড থাকবে না!

—নিশ্চয়ই থাকবে।

—তুমি ছেলেমানুষ, তুমি ঠিক বুঝতে পারছ না। ভাবীজী, আপনি কি তাকে হাসব্যান্ড হিসেবে তখন মেনে নিতে পারবেন?

—সমাজ আমাকে মেনে নিতে বলবে।

—আপনি নিজে?

—জানি না। ভেবে দেখিনি।

জাফর বলল, আমিও বুঝতে পারি না। দেব নিজে ইচ্ছে করে লুকিয়ে না থাকলে এতদিনেও তার ট্রেস পাওয়া যাবে না—এ হতেই পারে না। মরে গেলেও তার ডেড বডি পাওয়া যেত। আমার মনে হয় সে ইচ্ছে করেই কোথাও—অথচ আপনি বলছেন, সে বেঁচে নেই—

তপতী বলল, আমার কলেজের এক বন্ধুর বাবার কি হয়েছিল জানেন? কলকাতার রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ হার্ট ফেল করেন। পকেটে কোন কাগজপত্র ছিল না—পুলিশ তাঁর পরিচয় জানতে পারে নি—মর্গে রেখে দিয়েছিল। সাতদিন পর তাঁর খোঁজা-খুঁজি শুরু হয়—ওঁর তখন কলকাতায় থাকার কথা নয়, আসামে থাকার কথা—তাই সবাই আসামে খুঁজছে। ওদের এক আত্মীয়

ছিল পুলিসে—বাইচান্স তিনি কলকাতায়—তখন ভাল করে চেনাই যায় না।

জাফর বলল, দেবের কেস সেরকম হতেই পারে না।

মাধুরী বলল, থাক, ও আলোচনা আর নয়। এখন থাক।

জাফর বলল, হ্যাঁ, তাই থাক। আপনি বুঝি এ নিয়ে আর বেশী ভাবতে চান না?

—এই কয়েক মাস অনেক ভেবেছি। ভাবতে ভাবতে সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। আর বেশী ভাবলে পাগল হয়ে যাবে বোধহয়।

—মনটাকে অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিন। একটা গান করুন না।

—আমি? না, এখন গান আসবে না।

—ভাবী, আপনি একসময় ভাল গান করতেন। আমি শুনেছি। আপনি যদি আবার গান-বাজনায় চর্চা শুরু করেন—মনটা ভুলে থাকবে।

—আচ্ছা সে দেখা যাবে। আপনি এখন একটা গান করুন।

—আমার গলায় গান নেই। মীর্জা গালিবের এক গজল শুনবেন? আপনি তো উর্দু বোঝেন?

—একটু একটু।

—এইটা শুনুন।

কঈ আগহ্ নহ্‌ঁী বাতিনে হম্ দিগার সে

হ্যায় হরেক ফার্দ জঁহা সে বরকে ন খান্দা।

মানে বুঝলেন তো? কার মনে যে কি আছে আমরা কিছুই বুঝি না। পৃথিবীর সব মানুষই যেন না পড়া বইয়ের পাতা।

প্রিয়ব্রত বলল, বাঃ, চমৎকার। আর একটা বলুন। জাফর আরও কয়েকটা গজল শোনাল। তারপর একটা গান করল তপতী। প্রিয়ব্রত শুনিয়ে দিল নজরুল ইসলামের কবিতা। খানিকটা সময় বেশ হালকা ভাবে কেটে গেল।

এখন রোদ উঠেছে চড়া হয়ে। ওদের পরিকল্পনা আছে ওপারে

পৌঁছে খাওয়া-দাওয়া হবে। প্রিয়ব্রত বলল, জাফরদা, আমাদের নামবার দরকার কি! জলের ওপরেই থাকি না। ইস, আমার ইচ্ছে করছে সাঁতার কাটতে। একটু সাঁতার কেটে নেব?

প্রিয়ব্রত সত্যি সত্যি জলে ঝাঁপিয়ে পড়ার উদ্যোগ করল। মাধুরী তাকে বাধা দিয়ে বলল, না, প্রিয়, এখানে সাঁতার কাটতে হবে না। অনেক জল।

প্রিয়ব্রত হাসতে হাসতে বলল, তাতে কি হয়েছে। আমি খুব ভাল সাঁতার জানি। আমার কিছু হবে না।

—এখানে প্রত্যেক বছর একজন করে ডুবে যায়।

—আমার কিছু হবে না। দেখো তুমি।

—না, তুই নামবি না।

জাফর বলল, নামুক না। ক্ষতি কি। ভয়ের কিছু নেই। বোট তো কাছে কাছেই থাকবে।

মাধুরী তবু এমন দৃঢ়স্বরে না বলল যে সবাই চমকে গেল। প্রিয়ব্রত আস্তে আস্তে বসে পড়ে বলল, আচ্ছা, ঠিক আছে, নামব না।

একটুক্ষণ সবাই চুপচাপ। মাধুরী নিজেই আবার বলল, প্রিয়, তুই রাগ করলি? আচ্ছা, পারের কাছে যাই, ওখানে সাঁতার কাটিস।

প্রিয়ব্রত বলল, না, রাগ করি নি।

জাফর বলল, আপনি এমন জোরে বকুনি দিলেন যে আমরা শুদ্ধ ভয় পেয়ে গেলুম।

মাধুরী এবার হাসল। বলল, আমার যখন বিয়ে হয়—তখন ও কত ছোট ছিল। আট ন' বছর বয়েস। খুব দুষ্টু ছিল। ওকে বকুনি দেওয়া আমার অভ্যেস হয়ে গেছে।

—আপনাকে দেখলে মনে হয় না, আপনি কারুকে বকুনি দিতে পারেন।

—আর কারুকে পারি না, শুধু ওকে পারি।

হোসেন সাগর পার হয়ে ওরা নামল একটা নির্জন জায়গায়। ছোটখাটো একটা জঙ্গলের মতন, কাছাকাছি কোন বাড়ি-ঘর নেই। লঞ্চ থেকে সতরঞ্চি নামিয়ে পাতা হল মাটিতে, খোলা হল খাবারের বাস্কেট। জাফর বলল, ইস, দাবার সেইটা আনলে হত।

প্রিয়ব্রত বলল, না এনে ভালই হয়েছে। পিকনিক করতে এসে বুঝি কেউ দাবা খেলে?

—তাহলে এখন কি করা হবে?

—কেন, আপনারা স্নান করবেন না?

—তুমি সাঁতার কাটার কথা এখনো ভোল নি দেখছি। এ জায়গাটার জল বড্ড নোংরা। আজ সাঁতার কাটা বন্ধই থাক বরং। এখানে বেশ ছায়া আছে, বসে বসে এমনিই গল্প করা যাক।

মাধুরী এতক্ষণ বাদে লক্ষ্য করল জাফর আজ সর্বক্ষণ প্রিয়ব্রত আর তার সঙ্গেই বেশী কথা বলেছে—তপতীর সঙ্গে সরাসরি কোন কথা বলে নি। এমন কি তপতীর মুখের দিকে তাকায় নি পর্যন্ত। জাফরের ব্যবহার অত্যন্ত ভদ্র ও মার্জিত—মাধুরীর শোক-দুঃখ ভোলাবার জন্য তার প্রতি বেশী মনোযোগ দেবে—এটা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু তপতীকে এড়িয়ে যাচ্ছে কেন? এর আগে তপতীর সম্পর্কে জাফরের বেশী উৎসাহ তো সে লক্ষ্য করেছে। এর মধ্যে কি অন্য কিছু ঘটে গেল?

জাফর কথায় কথায় জানাল যে শিগগিরই সে একটা স্কলারশীপ নিয়ে বিলেতে চলে যাচ্ছে। কথাটা শুনে তপতী চমকে উঠে একবার জাফরের দিকে তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিল। মাধুরীও অবাক হল। ইংরেজ জাতি সম্পর্কে জাফরের মনোভাব এতকাল বিরূপ ছিল, ইয়োরোপীয় সভ্যতার প্রতি কোন মোহ ছিল না। তবু জাফর হঠাৎ বিলেত যাচ্ছে কেন?

মাধুরী জিজ্ঞেস করল, কত দিনের জন্য?

জাফর উদাসীন ভাবে বলল, ঠিক নেই। দেখা যাক।

—বিলেতে থাকতে আপনার ভালো লাগবে?

—আস্তে আস্তে মানিয়ে নেব।

মাধুরী চুপ করে গেল। তপতী আঙুল দিয়ে সতরঞ্চির ওপর দাগ কাটছে। প্রিয়ব্রত একটু দূরে একটা গাছ থেকে ফুল পাড়ার চেষ্টা করছে। জাফর একটা সিগারেট ধরাল। কনুইয়ে খানিকটা হেলান দিয়ে শুয়ে দূরের দিকে তাকিয়ে বলল, দেব যদি এখানে থাকত তা হলে হয়তো আমি বিলেত যেতাম না। অনেকটা দেবের জন্যই আমাকে যেতে হচ্ছে।

মাধুরী এ-কথার অর্থটা পুরোপুরি বুঝল না, খানিকটা যেন আভাস পেল, কিন্তু কোন প্রশ্ন করল না। তপতী উঠে চলে গেল প্রিয়ব্রতর কাছে।

॥ ৪ ॥

এরপর চার বছর কেটে গেছে। গগনেন্দ্রনাথ চাকরী থেকে রিটায়ার করেছেন। প্রিয়ব্রত স্কুল ফাইন্যাল পাস করেছে। বিয়ে হয়েছে তপতীর, সে থাকে জব্বলপুরে। আরও অনেক কিছু বদলেছে।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অনেক কিছুই অবধারিত ভাবে বদলায়। দেবব্রতর অনস্তিত্ব এখন সত্য বলে মেনে নেওয়া হয়েছে। দৈবাৎ বাড়ীতে কোন আত্মীয়স্বজন এলেই দেবব্রতর প্রসঙ্গ ওঠে। না হলে, নিজেদের মধ্যে ওবিষয়ে আর সাধারণত আলোচনা করে না। কখনো হয়ত প্রিয়ব্রত খাবার টেবিলে বলে ফেলে, দাদা নেই বলে এখন আর আমাদের বাড়িতে ঝাল রান্না হয় না। এ-রকম ঝাল ছাড়া মাংস দাদা মুখে তুলতে পারত না। কিংবা, দেবব্রতর ব্যবহৃত টেবিল বা আলমারিকে এখনো ওরা বলে দাদার টেবিল বা দাদার আলমারি। এসব কথার মধ্যে বেদনাবোধ ছুঁয়ে থাকে না।

কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে জব্বলপুরের এক পাত্রের সঙ্গে তপতীর

বিয়ে ঠিক করলেন গগনেন্দ্রনাথ। তপতী কোন আপত্তি করল না। আজকাল আর তার সেই সাজপোশাকের উগ্রতা নেই, বাড়ির বাইরে বেশীক্ষণ থাকে না—মায়ের সেবা করে। জাফর বিদেশে চলে গেছে।

জব্বলপুরের পাত্রটি বেশ ভালই। ছেলেটির নাম পরিতোষ চৌধুরী, সরকারী হাসপাতালের ডাক্তার। উপযুক্ত বংশ। ছেলেটিকে দেখে গগনেন্দ্রনাথের খুবই পছন্দ হয়ে গেল। কিন্তু পাত্রের বাবার দাবী বড্ড বেশী—এত দিতে গেলে গগনেন্দ্রনাথের সঞ্চয়ের টাকার আর কিছুই থাকবে না। তবু তিনি দ্বিধা করলেন না—একটিই মাত্র তাঁর মেয়ে। তা ছাড়া, এই ছেলেটির সঙ্গে তাঁর মেয়ের ঠিকুজিকুষ্ঠির অদ্ভুত মিল দেখা গেছে। গগনেন্দ্রনাথ আগে এসব বেশী মানতেন না, কিন্তু এখন দুর্বল হয়ে পড়েছেন। মেয়ের কপালে যাতে কোনদিনই দুর্ভাগ্য না আসে—এ সম্পর্কে তিনি সাধ্যমতন ব্যবস্থা করে যেতে চান।

খুব ধুমধাম করে বিয়ে হয়ে গেল তপতীর। হায়দ্রাবাদের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি নিমন্ত্রণ খেয়ে গেলেন। শানাইতে বসন্ত বাহার বাজল। কিন্তু বিয়ের দিনটিতে দেবব্রতর কথা আবার নতুন করে মনে পড়ল সকলের। নতুন রকমের দুঃখ। বোনের বিয়েতে দেবব্রতরই সর্বকিছু করার কথা। তার এত আদরের বোন, দেবব্রত থাকলে কত আনন্দ হৈ-হৈ করত। সে নেই, গগনেন্দ্রনাথ খেটে মরছেন। বাইরের কোন লোক জানল না, সেদিন ও বাড়িতে অত আনন্দ হৈ-চৈ-এর মধ্যেও এক সময় এক ঘরে বাড়ির সবাই কিছুক্ষণ কেঁদে নিয়েছে।

বিয়ের পর তপতী জব্বলপুরে চলে যাবার পর গগনেন্দ্রনাথ বুঝতে পারলেন তিনি একটা ভুল করেছেন। আর একটু চেষ্টা-চরিত্র করে হায়দ্রাবাদেরই কোন পাত্রর সঙ্গে তপতীর বিয়ে দিতে পারতেন। তা হলে অন্তত মেয়েকে চোখের দেখা, দেখা যেত ইচ্ছে করলেই। মেয়ের বিয়ে দিয়ে তাকে পরের ঘরে পাঠাতেই হয়—কিন্তু একই শহরে তো শ্বশুরবাড়ি হতে পারত। কেন না, তপতী চলে যাবার পর

বাড়ি যেন একেবারে অন্ধকার হয়ে গেল। দেবব্রতর অভাবের চেয়েও তপতীর অভাব যেন আরও প্রকট। তপতী একাই যেন সারা বাড়ি ভরে ছিল, এখন সব দিক শূন্য।

সবচেয়ে বেশী কষ্ট পেতে লাগলেন মন্দাকিনী। অসুখে ভোগার পর থেকেই তিনি তপতীকে একেবারে আঁকড়ে ধরেছিলেন। এখন যেন তাঁর আর বেঁচে থাকার কোন মূল্যই রইল না।

প্রথম কয়েক মাস তপতী ঘন ঘন কয়েকবার বাপের বাড়ি ঘুরে গেল। তারপর কমে গেল স্বাভাবিক ভাবেই। পরিতোষ এটা পছন্দ করে না। বিবাহিত জীবনে তপতীকে এমনিতে বেশ সুখীই মনে হয়—বাবা-মায়ের দুর্বলতার জন্য তার সংসারে বিঘ্ন আনার কোন যুক্তি নেই। গগনেন্দ্রনাথ আর তপতীকে আনবার জন্য পীড়াপিড়ি করেন না। মন্দাকিনী একা একা দুঃখ পান।

হায়দ্রাবাদের বাঙালী সমাজটি খুব ছোট। প্রথম দিকে অনেক চেষ্টা করেও গগনেন্দ্রনাথ মেয়ের জন্য উপযুক্ত কোন পাত্র খুঁজে পান নি। আরও কিছুদিন অপেক্ষা করলেও তো চলত। গগনেন্দ্রনাথ ব্যস্ত হয়েছিলেন, নিজে চাকরি থেকে রিটায়ার করার আগে মেয়ের বিয়েটা দিয়ে নির্ঝঞ্ঝাট হবেন। কিন্তু তপতীকে বিয়ে দিয়ে দূরে পাঠিয়ে দেবার পর হায়দ্রাবাদ তাঁর অসহ্য লাগল। এই শহর তখন তার কাছে নিষ্প্রাণ।

তখন মনে পড়ল কলকাতার কথা। এক সময় তিনি ভেবে রেখেছিলেন, চাকরি-জীবন শেষ হলে তিনি আবার সপরিবারে কলকাতায় ফিরে যাবেন। শেষজীবনটা বাংলার বাতাসে নিশ্বাস নিয়েই কাটাবেন। কিন্তু দেবব্রতও হায়দ্রাবাদে চাকরি পাওয়ায় সে পরিকল্পনা তিনি পরিত্যাগ করেছিলেন। ছেলে এখানে থাকলে তিনি আর অন্য জায়গায় চলে যাবেন কি করে। এখন দেবব্রত নেই, তার ফিরে আসার সম্ভাবনাও এখনো মনে স্থান পায় না—তা হলে আর এখানে থেকে কি লাভ! দেবব্রতর বিয়ের ঠিক আগেই তিনি

ভাড়াবাড়ি ছেড়ে এই বাড়িটি কিনেছিলেন। বাংলা ধরনের একতলা বাড়ি, ভারী সুন্দর। এখন আর এ বাড়িটাও ভাল লাগে না।

রিটায়ার করার কয়েক মাস আগে গগনেন্দ্রনাথ বাড়ির সকলকে নিয়ে কলকাতা থেকে বেরিয়ে এলেন। সঙ্গে নিয়ে গেলেন মাধুরীকেও। মাধুরী মাঝে একবার বাপের বাড়ি ঘুরে এলেও—তপতীর বিয়ের সময় সেই যে এসেছিল, আর যায় নি। সে বুঝেছে, তপতীর অভাবটা তার শ্বশুর এখন তাকে দিয়েই কিছুটা মেটাতে চান। সে এখন যেন ঠিক এ বাড়ির পুত্রবধূ নয়, অনেকটা মেয়ের মতন।

অনেককাল বাদে কলকাতায় এসে গগনেন্দ্রনাথের খুব ভাল লেগে গেল। পুরনো দিনের চেনা বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে গল্প করে বেশ আরাম হয়। প্রিয়ব্রত এর আগে কখনো কলকাতায় আসে নি, অনেক গল্প শুনেছে—তার দারুণ উৎসাহ। তার গোপন ইচ্ছে কলকাতায় এসে কলেজে পড়ার। ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি থেকে ডিগ্রী নেওয়ার দাম অনেক বেশী।

গগনেন্দ্রও মনস্থির করে ফেললেন। টালিগঞ্জের কাছে একটা ছোটখাটো বাড়ি বেশ পছন্দ হয়ে গেল। দরদাম ঠিক করে ফিরে এলেন হায়দ্রাবাদে। এখানকার বাড়িটা বিক্রি করে দিলেন। রিটায়ার করার পর এক মাসের মধ্যেই হায়দ্রাবাদের সঙ্গে সব সম্পর্ক ঘুচিয়ে চলে এলেন কলকাতায়। প্রিয়ব্রত ভর্তি হল সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে।

কলকাতায় এসে মেয়ের কথা ভেবে গগনেন্দ্রর আবার আপশোস হল। আর কিছুদিন অপেক্ষা করলে কলকাতাতেই তপতীর বিয়ে দিতে পারতেন। কলকাতায় তো সুপাত্রের অভাব নেই। জব্বলপুরের জামাইয়ের সম্পর্কেও তিনি খুব খুশী নন। তপতী অবশ্য চিঠিতে কোন অভিযোগের কথাই লেখে না, বরং অনেক উচ্ছ্বাস থাকে—কিন্তু তিনি কানাঘুষোয় খবর পেয়েছেন পরিতোষের একটু চরিত্র-দোষ আছে। বিয়ের ঠিক আগেই একজন নার্সের সঙ্গে নাম জড়িয়ে

পরিতোষের নামে একটা কেলেঙ্কারী ছড়িয়ে পড়েছিল। তিনি তপতীকে চিঠি লিখলেন, পরিতোষ কি কলকাতায় এসে ডাক্তারী শুরু করতে পারে না? তার টালিগঞ্জের বাড়িতে জায়গা আছে। এর উত্তরে পরিতোষ নিজেই জানাল যে, জব্বলপুরে তাদের তিন পুরুষের বাস—সে সব ছেড়ে কলকাতায় আসার কোন প্রশ্নই ওঠে না। গগনেন্দ্র আর উচ্চবাচ্য করলেন না।

টালিগঞ্জের বাড়িটা ছোট হলেও বেশ খোলামেলা। ট্রাম-লাইন থেকে একটু দূরে, নিরিবিলিতে। ওপরে তিনখানা ঘর, নিচে দুখানা, একফালি উঠোন ও দুটি বারান্দা। তিনতলাতেও একটি ঘর আছে, সেটি প্রিয়ব্রত পড়ার ঘর করেছে। একতলায় একটি ঘর বৈঠকখানা—বাকিটা খালিই পড়ে থাকে।

নতুন করে বাড়ি সাজানোর ফলে আর দেবব্রতর জামা আলনায় ঝোলে না, বাথরুমে তার টুথব্রাস থাকে না। মাধুরীর বিছানায় এখন একটিই বালিশ। দেয়ালে এখন দেবব্রতর একটি বাঁধানো ছবি ঝোলে—বিয়ের আগেকার, সে তখন সদ্য ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করে কনভোকেশনের সময় ডিগ্রী নিচ্ছে—সেই ছবি।

নতুন পরিবেশে নতুন জীবন অনেক স্বচ্ছন্দ। রান্নার জন্য একজন রাঁধুনি রাখা হয়েছে, কিন্তু খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা এখন মাধুরীর হাতে। তার স্বাস্থ্য এখন চমৎকার, মন প্রফুল্ল। সকালবেলা সেই সবার আগে ওঠে। স্টোভ ধরিয়ে চা বানায়। প্রথম এসে ডাকে প্রিয়ব্রতকে।

এখানে এসে প্রিয়ব্রতর কলেজে ভর্তি হতে একটু দেরী হয়েছে, তাকে পড়াশুনোর জন্য বেশী খাটতে হবে। এদিকে প্রিয়ব্রতটা হয়েছে অসম্ভব ঘুম-কাতুরে। মাধুরী এসে বেশ কয়েকবার দরজায় ধাক্কা দিলে প্রিয়ব্রত ওঠে। ঘুম-চোখে পায়জামার দড়ি বাঁধতে বাঁধতে এসে দরজা খুলে ঝাঁঝালো গলায় বলে, উঃ, আর একটু পরে চা দিতে পারো না! এখনো কাক-পক্ষীও ডাকেনি।

মাধুরী বলে, ক'টা বাজে জানিস? সাড়ে পাঁচটা!

—তোমরা এখনো গাইয়াই রয়ে গেলে। কলকাতার লোক এত তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে ওঠে না।

—ট্রাম চলছে। আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিস না?

—চলুক। কলকাতার বেশীর ভাগ মানুষ দেরী করে ঘুম থেকে ওঠে, সেইটাই ফ্যাশান।

প্রিয়ব্রতর বড় বড় চুলগুলো ঝুলে পড়েছে কপালে। দেখতে দেখতে বেশ লম্বা হয়ে গেছে সে। গলার আওয়াজে আর কৈশোরের চিহ্ন নেই। তার দিকে চেয়ে থেকে সস্নেহ বকুনি দিয়ে মাধুরী বলল, খুব কালকেশিয়ান হয়ে গেছিস! যা মুখ ধুয়ে আয়।

প্রিয়ব্রত আবার শুয়ে পড়ার উদ্যোগ করছিল, বলল, দাও চা-টা দাও, খেয়ে আর একটু ঘুম দিয়ে নিই।

প্রিয়ব্রত মুখ না ধুয়েই চা খেতে চায়। মাধুরী কিছুতেই তা দেবে না। রোজ এই নিয়ে জোর করতে হয় মাধুরীকে। সে বলল, আবার ঘুমুবি কি? পড়তে বসতে হবে না?

—বৌদি, তুমি আজকাল আমার ওপর বড্ড গার্জেনি করছ।

—করব না! বাবা কিছু বলেন না—

দু'জনে সেখানে বসেই চা খেয়ে নেয়। কলকাতা শহর তখন আস্তে আস্তে জাগছে। কাক ও শালিকের ডাক ছাড়িয়ে ক্রমে ক্রমে শোনা যাচ্ছে ট্রাফিকের শব্দ।

প্রিয়ব্রত বাথরুমে চলে গেলে মাধুরী শ্বশুর-শাশুড়ির জন্যে ফলের রস বানাতে বসে। ওঁরা সকালে চা খান না। ফলের রস খেয়ে গগনেন্দ্র বেরিয়ে যান প্রাতঃভ্রমণে। মন্দাকিনী বিছানাতেই শুয়ে থাকেন—মাধুরী তাঁকে ওষুধ দেয়। তারপর রাঁধুনিকে দেয় জলখাবার বানাবার নির্দেশ। চাকরকে বাজারে পাঠায়।

দশটার মধ্যে প্রিয়ব্রত খেয়ে-দেয়ে কলেজে বেরিয়ে যায়। ততক্ষণই সারা বাড়িতে কিছুটা ব্যস্ততা থাকে। তারপর অখণ্ড

অবসর, সারা বাড়ি নিঝুম। কোন কোন দুপুরে গগনেন্দ্র বেরিয়ে পড়েন পুরনো লোকজনের সঙ্গে দেখা করার জন্য, মন্দাকিনী ঘুমিয়ে থাকেন। মাধুরী দুপুরে ঘুমোতে পারে না—এই সময় তার কাটতেই চায় না। বই পড়ে পড়ে চোখ ব্যথা হয়ে যায়। এত বই-ই বা আসবে কোথা থেকে। মাধুরী বাংলা গল্প উপন্যাস পড়তে ভালবাসে—কিন্তু প্রিয়ব্রতর বাংলা পড়ার অভ্যেস নেই। সে ইংরিজির মাধ্যমে লেখাপড়া শিখেছে—হায়দ্রাবাদে মিশেছে অবাঙালীদের সঙ্গে—বাংলা পড়ার সুযোগ পেল কোথায়। এখন সে মাঝে মাঝে চেষ্টা করে, কিন্তু ধৈর্য রাখতে পারে না। তবে, সে প্রায়ই মাধুরীর জন্য বাংলা বই ও পত্র-পত্রিকা কিনে আনে।

প্রিয়ব্রত সন্ধ্যের পর বাড়ির বাইরে থাকে না। কোন কোনদিন হঠাৎ কলেজ ছুটি হলে সে দুপুরেও বাড়ি ফিরে আসে। এই নতুন পরিবেশে তার বিশেষ কোন বন্ধুবান্ধব হয়নি, একা একা কোথাও যায় না। বাইরে সে এখনো লাজুক স্বভাবের, লোকের সঙ্গে মিশতে পারে না। এখন বৌদিই তার একমাত্র বন্ধু, বৌদির সঙ্গে যতরকম গল্প।

কোন কোনদিন মাধুরীকে নিয়ে সে সিনেমা দেখতে যায়। কলকাতা শহরে এত মানুষ, রাস্তায় গিজগিজ করছে মানুষ, বাসে ট্রামে ভর্তি মানুষ—কিন্তু সবাই ওদের কাছে অচেনা। এমনকি সব রাস্তাঘাটও এখনো চেনে না ভাল করে। দুজনে সাবধানে রাস্তা দিয়ে হাঁটে, ট্যাক্সি নিয়ে শুধু সিনেমায় যায় আর ফিরে আসে।

মাধুরী আজকাল বেশীর ভাগ সময়েই সাদা শাড়ি পরে। সিঁথিতে খুব সূক্ষ্মভাবে সিঁদুর দেয় অবশ্য—কিন্তু প্রত্যেকদিন সিঁদুর লাগাবার সময় সে একটু অদ্ভুতভাবে হাসে। মাছ-মাংস ছেড়ে দেবে কিনা ভাবছে। কেউ তাকে কিছু বলেনি, তবু সে মনে মনে প্রায় বিধবা হয়ে গেছে। একমাত্র মন্দাকিনীই যদি কোন সময় মাধুরীর সিঁথিতে সিঁদুর দেখতে না পান—অমনি তীক্ষ্ণভাবে

তাকিয়ে প্রশ্ন করেন, বৌমা, সিঁদুর দাও নি কেন?

সাধারণ ছিমছাম পোশাকেও মাধুরীকে এত সুন্দর দেখায় যে মানুষজন তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। তার ছেলেটি জন্মে মারা যাবার পর মাধুরীর স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে পড়েছিল। এখন যেন আগের থেকেও ভাল হয়েছে। মাত্র পঁচিশ বছর তো বয়েস তার।

প্রিয়ব্রত একদিন কথায় কথায় বলল, আচ্ছা বৌদি, তুমি কি এই রকম করেই সারাজীবন কাটাবে?

মাধুরী জিজ্ঞেস করল, কি রকম করে?

—এই যে, সারাদিন শুধু রান্নাবান্না আর রুগীর সেবা করে কাটাবে?

—তা ছাড়া আর কি করব? সবাই তো এরকমই করে। আর কি করে?

এর কোন মানে হয় না। একটা কিছু করা উচিত।

—বাঃ, এগুলো বুঝি কাজ নয়? রুগীর সেবা করা কাজ নয়? আমি না করলে কে এখন তোমার মাকে দেখবে?

—সে কথা হচ্ছে না। তুমি সারাটা জীবন কি ভাবে কাটাবে—সে কথা ভাবতে হবে তো!

—তুই ভাবছিস বুঝি খুব? তোকে অত মাথা ঘামাতে হবে না—তুই পড়াশুনো কর তো মন দিয়ে!

—বৌদি, তুমি গান-বাজনা আবার শুরু কর। কলকাতায় অনেক সুযোগ। ইচ্ছে করলে তুমি শান্তিনিকেতনে গিয়েও তো গান শিখতে পার।

—আমার আর গান গাইতে ভাল লাগে না।

—কালকেই তো একলা একলা গাইছিলে।

—কখন? যাঃ!

—আমি শুনেছি।

—সে একটু আধটু গুণ গুণ করে সবাই। শেখা টেখার আর

আমার ইচ্ছে নেই।

—তা হলে বি. এ. পরীক্ষাটা দিয়ে দাও না! তোমার তো এখন অনেক সময়—দুপুরবেলাটায় পড়বে।

—রক্ষে কর! এই বয়েসে আবার ছাত্রী সাজব?

—বেশ বুড়ি বুড়ি ভাব দেখিও না। সত্যি বৌদি, তুমি পরীক্ষাটা দিয়ে দাও প্রাইভেটে। এক বছর পড়লেই পারবে।

—এখানকার কোর্স আলাদা।

—তা হলেই বা। এক বছরে ঠিক মেক-আপ করে নিতে পারবে। বেশ মজা হবে। তোমাতে আমাতে বেশ একসঙ্গে পড়া যাবে। সিলেবাস নিয়ে আসব কালকে?

মাধুরী খানিকটা রাজী হয়েছিল—কিন্তু তক্ষুনি পড়াশুনো শুরু হল না। কয়েকদিনের মধ্যেই পরিতোষ আর তপতী বেড়াতে এল। খুব হৈ-হৈ চলল ক'দিন। পরিতোষ একটু হালকা স্বভাবের আমুদে ধরনের মানুষ—মেয়েদের সামনেও অসভ্য কথা বলতে ভালবাসে। প্রথম প্রথম মাধুরীর কান লাল হয়ে যেত—কিন্তু পরিতোষের সঙ্গে তার রসিকতারই সম্পর্ক, সুতরাং আপত্তি করা যায় না।

পরিতোষের আর একটি স্বভাব, সে লোকজনের সামনেই নিজের স্ত্রীকে আদর করে। কথা বলতে বলতে চাপড় মারে তপতীর উরুতে। যখন-তখন তাকে জড়িয়ে ধরে। দু-একবার সে মাধুরীকেও জড়িয়ে ধরেছে ঠাট্টার ছলে। মাধুরীর গা শির শির করে। তার এসব দেখার অভ্যেস নেই। সে রক্ষণশীল পরিবারের মেয়ে, শ্বশুর-বাড়িতেও মোটামুটি রক্ষণশীল আবহাওয়া। পরিতোষ এসব গ্রাহ্যই করে না। এমনকি শ্বশুরমশাইকে দেখে অতিরিক্ত ভয় দেখাবার অভ্যেসও তার নেই, গগনেন্দ্রনাথের সামনেই সে অবলীলাক্রমে সিগারেট ধরায়—গগনেন্দ্রনাথ অবশ্য কোনরকম বিরক্তি প্রকাশ করেন না।

পরিতোষ আসবার জন্যই ওদের সকলের কলকাতা শহরটা ভাল করে দেখা হয়ে গেল। এতদিন মাধুরী ও প্রিয়ব্রত কেউই ইডেন

গার্ডেনস বা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল দেখেনি, মিউজিয়ামে ঢোকেনি। কিংবা উত্তর কলকাতার বনেদী থিয়েটারগুলো দেখা হয়নি। পরিতোষ প্রত্যেকদিনই কোথাও না কোথাও যাবার প্রোগ্রাম করল। পরিতোষ জলের মতন টাকা খরচ করে—পার্কস্ট্রীটের হোটেলে ওদের সবাইকে নিয়ে খাবার খাওয়াতে গিয়ে ঢালাও অর্ডার দেয়। এতই বেশী খরচে স্বভাব তার যে দশ দিন বাদে তপতীকে রেখে সে একা ফিরে যাবার সময় হঠাৎ খেয়াল করল যে তার সব টাকা ফুরিয়ে গেছে। চুপি চুপি মাধুরীকে বলল, বৌদি, আমাকে পাঁচশোটা টাকা দাও তো। গিয়েই তোমাকে পাঠিয়ে দেব।

মাধুরী অকূল পাথারে পড়ল। তার নিজস্ব কোন টাকাই নেই। দেবব্রত থাকার সময় সে যখন যা দরকার চেয়ে নিত। দেবব্রত চলে যাবার পর থেকে সে আর টাকা পাবে কোথায়?

এ বাড়িতে সংসার-খরচের টাকাপয়সা সব তার হাতেই থাকে। গগনেন্দ্র নিজে এখন আর কিছুই দেখেন না। কিন্তু সেই টাকা থেকে মাধুরী দেবে কি করে? অন্তত একবার গগনেন্দ্রকে বলা দরকার। পরিতোষ এদিকে বলছে, আর কারুকে না জানাতে, বিশেষত তপতী যেন জানতে না পারে। হাসতে হাসতে বলল, ও যা বকুনি দেবে আমাকে! আমার একদম হিসেব থাকে না।

মাধুরী কিছুতেই মুখ ফুটে বলতে পারল না যে তার নিজের কোন টাকাই নেই। পরিতোষ হয়তো বিশ্বাস করবে না, দুঃখিত হবে। বাড়ির জামাইয়ের একটা মানসম্মানও আছে—সে মুখ ফুটে একটা কথা বলছে—সেটা অগ্রাহ্যও করা যায় না। এই কথাটা শ্বশুরকে বলাও বোধ হয় জামাইয়ের পক্ষে সম্মানজনক হবে না। আর বেশি চিন্তা করতে না পেরে মাধুরী সংসার-খরচের টাকা থেকেই পাঁচশো টাকা দিয়ে দিল এবং পরিতোষ ফিরে গিয়ে ভুলে গেল সেই টাকা পাঠাতে।

তপতী থেকে গেল আরও পনেরো দিন। বিয়ের পর একটু

রোগা হয়ে গেছে তপতী, আগের তুলনায় গম্ভীর হয়ে গেছে। কিন্তু বৌদির প্রতি তার ভালবাসা আছে অকৃত্রিম। সারাদিন ধরে তারা গল্প করে আর দাবা খেলে। তপতী হাসতে হাসতে বলেছিল, বিয়ের পর সে আর একদিনও দাবা খেলেনি। তারা দাবা খেলার কথা শুনে শ্বশুরবাড়ির সবাই অবাক হয়ে গিয়েছিল। মেয়েমানুষের দাবা খেলা নাকি অলক্ষ্মীপনা।

তপতীকে মাধুরী জিজ্ঞেস করছিল, শ্বশুরবাড়িতে তুমি সারাদিন কি কর গো?

তপতী বলল, কি আর করব। সকালবেলা উঠে চা-টা করি। শাশুড়িকে ওষুধ খাওয়াই—দুপুরবেলাটা কিছুই করার থাকে না—বই-টই পড়ি। সন্ধের পর কোন কোন দিন একটু বেড়াতে যাই—বেশীর ভাগ দিনই অবশ্য কোথাও যাই না, বাড়িতেই থাকি।

প্রিয়ব্রত বসেছিল পাশেই। তার দিকে তাকিয়ে মাধুরী বলল, কি রে শুনলি? সবাই এই করে।

তপতী বুঝতে পারল না। জিজ্ঞেস করল, কি ব্যাপার?

—এই দ্যাখ না। প্রিয় একদিন বলছিল, আমি নাকি সারাদিন কিছুই করি না। আমি নাকি জীবনটাকে নষ্ট করছি। অথচ তুমি ঠিক যা করো, আমিও তাই করি। এমন কি শাশুড়িকে ওষুধ খাওয়ানো পর্যন্ত।

তপতী হঠাৎ বিষণ্ণ হয়ে গেল। প্রিয়ব্রত ছেলেমানুষ, না বুঝে নিষ্ঠুরের মতন কথা বলেছে। মাধুরীর যে হাত-পা বাঁধা। সে আর মাধুরী সারাদিন একই রকম ভাবে কাটালেও একটা বিরাট তফাত আছে। তপতীর স্বামী আছে, মাধুরীর নেই। এই থাকা-না-থাকার মধ্যে কত কিছু বদলে যায়।

মাধুরী বিধবাও নয়, কুমারীও নয়, সধবার জীবনও নেই—এ রকম অদ্ভুত অবস্থায় আর কোন্ মেয়ে পড়ে? তবু অদ্ভুত মনের জোর মাধুরীর—সে কারুকে তার দুঃখ বুঝতে দেয় না।

মাধুরীও একটা জিনিস লক্ষ্য করল, তপতী পারতপক্ষে তার শ্বশুরবাড়ি কিংবা স্বামীর প্রসঙ্গ তোলে না। মাত্র এক বছর হল তার বিয়ে হয়েছে—এখন এই সব প্রসঙ্গই তো স্বাভাবিক ছিল। সে তার হায়দ্রাবাদের কুমারী জীবনের কথাই বার বার তোলে। সেই জীবনে ফিরে গিয়ে সে আনন্দ পায়। মাধুরীই এক সময় দুষ্টুমি করে জিজ্ঞেস করল, জাফরের খবর কি রে? বিলেত গিয়ে আমাদের সবাইকে ভুলে গেল?

অরুণবর্ণ মুখে তপতী জিজ্ঞেস করল, তোমাকে কোন চিঠি দেয় নি?

—না তো, বোধহয় কলকাতার ঠিকানা জানে না।

—আমি জানিয়েছিলাম।

মাধুরী একটু থমকে গেল। সংক্ষেপে বলল, ও।

তারপর আর একটু থেমে জিজ্ঞেস করল, কেমন আছে সে? ভাল আছে?

—হ্যাঁ, ভালই আছে।

—তুমি বুঝি প্রায়ই চিঠি লেখ।

—মাঝে মাঝে। এর মধ্যে দোষের কিছু আছে?

—আমি কি করে বলব বল!

—জাফরদারও বিয়ে হয়ে গেছে। ওর বউয়ের নাম তিশনা। ভারী মিষ্টি দেখতে। বৌকেও বিলেত নিয়ে গেছে। জাফরদা আমাকে মাঝে মাঝে চিঠি লেখে—আমিও দু'একটা উত্তর দিই। আচ্ছা বল তো বৌদি, এর মধ্যে দোষের কিছু আছে?

—দোষের কি থাকবে। জাফর অত্যন্ত ভদ্র ছেলে।

—ও রাগ করে।

পরিতোষ? আমি ভাই পুরুষ মানুষের মনের কথা বুঝি না।

দিন-পনেরো পর প্রিয়ব্রত গিয়ে তপতীকে পৌঁছে দিয়ে এল জব্বলপুরে! দু'তিন দিনের বেশী সে থাকে নি—কলকাতায় তার

পড়াশুনোর চাপ বেড়েছে। মাধুরী মনে মনে ক্ষীণ আশা রেখেছিল, প্রিয়ব্রতর হাত দিয়ে হয়তো পরিতোষ সেই পাঁচশো টাকা ফেরত পাঠাবে। কিন্তু পাঠায় নি, বোঝাই গেল। অদ্ভুত ধরনের মানুষ তো পরিতোষ। কৃপণ মোটেই নয়—অল্প কয়েক দিনে নিজে প্রায় হাজার দেড়েক টাকা খরচ করে গেছে। কিন্তু অন্যের টাকা ফেরত দিতে সে ভুলে যায়।

টাকাটার জন্য অবশ্য মাধুরীকে খুব বেশী বিপদে পড়তে হয়নি। তার কাছে তো কেউ হিসেব চাইবে না। তবু সংসার খরচের টাকায় টানা-টানি পড়লে শ্বশুরের কাছে তার তক্ষুনি টাকা চাইতে যেতে লজ্জা হয়। এর আগে কখনো লজ্জা হয় নি, যখন যা দরকার হয়েছে চেয়েছে—এই পাঁচশো টাকার ব্যবধানটা গগনেন্দ্রনাথ হয়তো লক্ষ্যও করতেন না—তবু মাধুরীর মনের মধ্যে এই একটা কাঁটা হয়ে রইল। কিছুদিন সংসার-খরচ টেনে-টুনে চালাল।

এই ঘটনার ফলে টাকা পয়সা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠল মাধুরী এর আগে সে টাকা পয়সার মূল্য সম্পর্কে কখনো চিন্তাই করে নি। অধিকাংশ মেয়েরই মতন সে জানত, টাকা জিনিসটা খরচ করারই জন্য—কি করে সেই টাকা আসবে বাড়িতে—সেটা পুরুষ মানুষদেরই ব্যাপার।

এখন সে অনুভব করল, তার নিজেরও কিছু অর্থ উপার্জনের চেষ্টা করা দরকার। গগনেন্দ্রনাথ অতুল সম্পদের অধিকারী নন্—মেয়ের বিয়ের জন্য এবং কলকাতায় বাড়ি কেনার জন্য অধিকাংশ জমানো টাকাই খরচ হয়ে গেছে। তাছাড়া, সারা জীবন তাঁকে সংসারের জোয়াল টানতে হবে—এজন্য তো তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁর উপযুক্ত ছেলে ভালো চাকরি পেয়েছিল—রিটায়ার করার পর গগনেন্দ্রনাথের তো ভারত-ভ্রমণে বেরিয়ে পড়ার কথা। জমা টাকা যা এখনো আছে, এরকম বসে বসে খেলে কতদিন আর চলবে? প্রিয়ব্রতর পড়াশুনো শেষ করে চাকরি পেতে এখনো অনেক দেরী—

তার পড়াশুনো চালাবারও তো একটা বড় খরচ আছে।

এই জন্যই কি গগনেন্দ্রনাথ একদিন কথায় কথায় বাড়ির এক-তলাটা ভাড়া দেবার কথা বলেছিলেন? অন্য কেউ তাতে রাজী হয়নি অবশ্য—অন্য লোকের সঙ্গে এক বাড়িতে থাকার অভ্যেস নেই ওদের কখনো। কলকাতায় এরকম অনেক থাকে—কিন্তু ওরা কলকাতার লোকদের মতন ফ্ল্যাট-বাড়িতে থাকার কথা কল্পনাই করতে পারে না। প্রিয়ব্রতই বেশী আপত্তি করেছিল গগনেন্দ্রনাথের প্রস্তাবে, গগনেন্দ্রনাথ চুপ করে গিয়েছিলেন। প্রিয়ব্রত ছেলেমানুষ, সে বুঝতে পারে না টাকাপয়সার দিকটার কথা।

গগনেন্দ্র যে মাঝে মাঝে দুপুরবেলা বেরিয়ে যান, মাধুরী বুঝতে পারল—উনি কিছু রোজগারের চেষ্টা করছেন। মাধুরীর বুকটা টন টন করে উঠল। গগনেন্দ্রনাথ চিরকাল রাসভারী ধরনের মানী লোক—এই বৃদ্ধ বয়েসে চাকরী খুঁজতে গেলে তাঁকে নিশ্চয়ই লোকের কাছে করুণা ভিক্ষা করতে হবে—এটা যে তাঁর মনে কতটা আঘাত দেবে—মাধুরী বুঝতে পারল। এইসব চিন্তাতেই গগনেন্দ্রনাথ আস্তে আস্তে ভেঙে পড়ছেন—ইদানীং তাঁর চেহারা দেখলেই বোঝা যায়।

টাকাপয়সার মতন একটা বাস্তব রূঢ় সত্য দেবব্রতর অনুপস্থিতি আবার নতুন করে মনে পড়িয়ে দিল। দেবব্রতর কোন টাকাপয়সা এ সংসারে আসে নি। তার নিজস্ব টাকাপয়সা সবই আটকে আছে। অফিসে তার প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড বা ইনসিওরেন্স-টাকা পাওয়া যায় নি কারণ তাকে তো মৃত বলে ঘোষণা করা হয়নি। গগনেন্দ্র সেটা কিছুতেই করতে চান না, হয়তো মাধুরীর মুখ চেয়েই। এমনকি দেবব্রতর জন্য এ সংসারে এখনো কিছু খরচ হয়! দেবব্রতর একটা বাইরের ইনসিওরেন্সের টাকা গগনেন্দ্রনাথ নিজে থেকে এখনো দিয়ে যাচ্ছেন প্রতি মাসে।

মাধুরী ঠিক করল, ঐ টাকাটা এ মাস থেকেই বন্ধ করতে হবে। এবং সে আরও ঠিক করল, প্রিয়ব্রতর কথা মতন বি. এ. পরীক্ষাটাও

দিয়ে দেবে। তারপর চেষ্টা করবে একটা চাকরির। সত্যিই তাকে চিন্তা করতে হবে ভবিষ্যতের কথা। তার বেঁচে থাকার জন্যও তো একটা অবলম্বন দরকার। দাদার সংসারে সে আর ফিরে যেতে পারবে না। এ সংসারেই বা সে বোঝা হয়ে থাকবে কেন সারা জীবন—তার উচিত যথাসাধ্য সাহায্য করা।

মাধুরী খুব মন দিয়ে পড়াশুনো করে বি. এ. পরীক্ষাটা দিয়ে দিল। এক সময় সে ভাল ছাত্রী ছিল, পাস করে গেল ডিস্টিংশান পেয়ে।

প্রিয়ব্রতর খুব উৎসাহ। বৌদির সঙ্গে একই বছরে সে পাশ করল বি. এসসি.। নিজে এম. এসসি-তে ভর্তি হয়ে বৌদিকেও পেড়াপেড়ী করতে লাগল এম. এ. পড়ার জন্য।

মাধুরী কোন জবাব না দিয়ে হাসল এবং কারুকে কিছু না বলে খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে দেখে দরখাস্ত পাঠাতে লাগল চাকরির জন্য। অধিকাংশই ইস্কুলের এবং কাছাকাছি। দু'তিন জায়গা থেকে ডাকও পেয়ে গেল। মাধুরীর অতিরিক্ত কয়েকটা যোগ্যতা আছে—বাংলার বাইরে এতকাল থাকার দরুণ সে ইংরেজি ও হিন্দী ভাল জানে। তা ছাড়া সে দেখতে সুন্দর—মেয়েদের এই অতিরিক্ত যোগ্যতার কথাটা অস্বীকার করা যায় না। মাধুরী অনায়াসেই চাকরি পেয়ে গেল একটা মিশনারি স্কুলে—মাইনে বেশ ভালই।

নিয়োগপত্র পাবার আগে মাধুরী কারুকে কিছু বলে নি। যেদিন ডাকে চিঠিখানি এল, সেদিন সন্ধ্যেবেলা সে একলা গিয়ে দাঁড়াল গগনেন্দ্রর সামনে গগনেন্দ্র তখন নিজের ঘরে বসে গড়গড়ার নল মুখে দিয়ে কি সব লেখালেখি করছিলেন। ইদানীং তিনি একখানা মোটা খাতায় কি সব লেখেন প্রায়ই—খাতাখানি তোলা থাকে আলমারিতে—কারুকে দেখতে দেন না।

মাধুরীকে দেখে তিনি চোখ তুলে তাকালেন, খাতাখানি মুড়ে

রাখলেন। বললেন, বৌমা, এ মাসের ইলেকট্রিকের বিল এখনও দেওয়া হয় নি। আমাকে কাল দিয়ে দিও।

দু একটা টুকিটাকি সাংসারিক কথা আলোচনা করার পর মাধুরী বলল, বাবা, আমি ভাবছি, আমি কিছু একটা কাজ করব।

গগনেন্দ্র ভাল করে তাকালেন মাধুরীর দিকে। বললেন, তুমি তো কম কাজ করছ।

মাধুরী হেসে বললে, তাও আমার হাতে অনেক সময় থাকে। সেইজন্যই ভাবছি, বাইরে যদি একটা কাজ নেওয়া যায়—

গগনেন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলেন সব কিছু। যেন শিশুর মতন লজ্জিত হয়ে পড়লেন। মুখ নিচু করে বললেন, চাকরি করবে ? বেশ তো। তোমার হাতে আজকাল বেশী টাকা দিতে পারি না।

—বাবা, সে জন্য নয়। এমনিতেই তো বাড়িতে বসে থাকি। একটা কাজ নিলে বাইরে বেরনোও হয়।

—তাছাড়া আর একটা কথা আমি কিছুদিন ধরে ভাবছিলাম। আমি মরে গেলে—তারপর তোমাদের কি হবে ? তোমাদের জন্য তো বিশেষ কিছু রেখে যেতে পারব না। তোমাকে তোমার নিজের ব্যবস্থা করে নিতে হবে এক সময়।

—আমি সে কথা ভাবি নি।

—জানি। এটা তোমার ভাববার কথা নয়, আমার ভাববার যখন যা করতে চাও, ইচ্ছে মতন করবে—আমি কখনো বাধা দেব না।

—আপনার যদি অমত থাকে—

—আমার কোন অমত নেই। হায়দ্রাবাদে থাকলে বাড়ির বৌকে চাকরি করতে পাঠাতে আমার সম্মানে হয়তো লাগত। কলকাতায় ওসব কেউ গ্রাহ্য করে না। চাকরি তো শুধু টাকার জন্য নয়—বাড়ির বাইরে যাবে, পাঁচজনের সঙ্গে মিশবে ! এসবও তো দরকার।

আমি একটা ইস্কুলে পড়াবার কথা ভাবছি।

—ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সময় কাটাতে তোমার ভালই

লাগবে।

গগনেন্দ্র চশমাটা খুলে টেবিলের ওপর রাখলেন। খুব ক্লান্ত দেখাল তার মুখখানা। চোখের দুপাশে কাকের পায়ের ছাপের মতন ভাঁজ পড়েছে। হাতের তালু দিয়ে চিবুকে ঘষতে ঘষতে বললেন, বউমা, আমার জন্যই তোমার জীবনটা নষ্ট হয়ে গেল।

—একথা বলছেন কেন?

—নিয়তি। মানুষের নিয়তি বড় প্রবল।

—বাবা আপনার শরীর খারাপ লাগছে না তো?

—না, শরীর ঠিক আছে। আমার জন্য ব্যস্ত হয়ো না।

মাধুরী লঘু পায়ে উঠে এল তিন তলায়। সারা ঘরে বই-পত্র ছড়িয়ে প্রিয়ব্রত পড়াশুনো করছে। বুকে বালিশ দিয়ে খাটে শুয়ে আছে, চোখ বইয়ের দিকে নিবদ্ধ। প্রিয়ব্রত চেয়ার-টেবিলে পড়তে পারে না—বই হাতে নিয়েই শুয়ে পড়ে সব সময়। যদিও খেলা-ধুলোয় সে যথেষ্ট ভাল। ইউনিভারসিটি টিমে ক্রিকেট খেলে—কিন্তু বাড়িতে তাকে দেখলে মনে হবে দারুণ অলস।

দেখতে দেখতে বেশ লম্বা হয়ে গেছে প্রিয়ব্রত, সুগঠিত শরীর। প্রচলিত ফ্যাশান অনুযায়ী বড় বড় চুল রেখেছে। স্বভাবে এখনো ছেলেমানুষ।

প্রিয়ব্রতর এক হাতে ধরা সিগারেট জ্বলছে। মাধুরীর উপস্থিতি সে টের পায় নি। মাধুরী তার হাত থেকে সিগারেটটা তুলে নিয়ে বলল, আবার এই সব খাচ্ছিস!

প্রিয়ব্রত চমকে উঠল। তারপর মাধুরীকে দেখে একগাল হেসে ফেলে বলল, ধরা পড়ে গেছি? কি হবে!

মাধুরী রাগী মুখ করে বলল, আমি আগেও দেখেছি।

—সেটা আমার দোষ নয়। তুমি ঘরে ঢোকবার সময় দরজায় নক্ করো না কেন? তাহলে ঠিক সময়ে নিভিয়ে ফেলতাম।

—ইস্! আর কক্ষনো খাবি না বলছি!

—তুমি জানো না—পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ক্লাসের ছেলেদের সিগারেট না খেলে প্রেস্টিজ থাকে না।

—বাজে বকিস না। সব ছেলেরাই খায়?

—মেয়েরাও খায়।

আমি একদিন সায়েন্স কলেজে গিয়ে দেখে আসব।

—এসো, যে-কোন দিন। আমাদের ক্যান্টিনে খাওয়াব তোমাকে। দারুণ সিঙ্গাড়া পাওয়া যায়।

মাধুরীর হাতে তখনও জলন্ত সিগারেট, ফেলে দিতে ভুলে গেছে। প্রিয়ব্রত উদ্ভাসিত মুখে বলল, বৌদি, তোমাকে গ্র্যান্ড দেখাচ্ছে! একবার টান দিয়ে দেখ না—তোমাকে দারুণ মানাবে।

মাধুরী সচেতন হয়ে তাড়াতাড়ি সিগারেট ফেলে দিল জানলা গলিয়ে। বলল, আজকাল বড্ড ফক্কড় হয়েছিস, না? একটা চাঁটি খাবি। এত যে সিগারেট খাচ্ছিস, পয়সা পাচ্ছিস কোথা থেকে?

প্রিয়ব্রত কাতর মুখভঙ্গি করে বলল, ভীষণ কষ্ট করে চালাতে হচ্ছে! আজকাল তুমি বড্ড কম পয়সা দাও। বন্ধুদের মধ্যে প্রেস্টিজ থাকে না।

মাধুরী মুখ টিপে হেসে বলল, দাঁড়া, এরপর বেশি দেব। আমি এখন চাকরি করছি তো—

—চাকরি? তুমি আবার কি চাকরি করবে?

—কেন, আমি বুঝি চাকরি করতে পারি না?

—কলকাতায় চাকরির বাজার দারুণ টাইট। সহজে কেউ চাকরি পায় না।

—আমি চাকরি পেয়ে গেছি। মিশনারি স্কুলে।

—কত মাইনে?

—সাড়ে চারশোর মতন, সব মিলিয়ে।

প্রিয়ব্রত লাফিয়ে উঠে বলল, গ্র্যান্ড! গ্র্যান্ড!

তারপর পেছন থেকে এসে মাধুরীর কোমর জড়িয়ে মাটি থেকে উ'চু করে তুলে বলল, দুর্দান্ত ব্যাপার! বৌদি তুমি তো এখন বড়লোক!

—ছাড়, ছাড়, পড়ে যাব।

—কি খাওয়াচ্ছ বল?

—দাঁড়া, আগে মাইনে পাই।

—ওসব শুনতে চাই না। সংসারের টাকা থেকে অ্যাডভান্স নাও! আজই চল।

—আজ নয়, আর একদিন।

—আর আমার চীনে-খাবার খেতে ইচ্ছে, চল না বৌদি, প্লিজ। বাবাকে বলেছ চাকরির কথা?

—হ্যাঁ, বাবাকে বলেছি—ওঁর মত আছে। মাকে এখনো বলা হয়নি।

—বাবাকে বললেই হবে। আমি বাবাকে বলে আসছি যে আমরা আজ একটু বেরুব।

বড়রাস্তা পর্যন্ত হে'টে এসে ওরা ট্রামের জন্য দাঁড়াল। প্রিয়ব্রত চাইছিল ট্যাক্সি ধরতে মাধুরী অত পয়সা খরচ করতে চায় না। দু'জনে উঠল ভিড়ের ট্রামে। অন্যান্য লোকজনের প্রতি ভ্রূক্ষেপ নেই প্রিয়ব্রতর—সে মাধুরীর সঙ্গে অনর্গল গল্প করে যাচ্ছে! চৌরঙ্গি অঞ্চলে নামবার সময় সে ভিড় ঠেলে সাবধানে মাধুরীর হাত ধরে নামাল—যেন তাঁর বৌদি একটা বহুমূল্য জিনিস, অন্য কারুর স্পর্শ না লাগে।

চীনে দোকানে এক টেবিলে বসেও প্রিয়ব্রতর গল্পের বিরাম নেই। আগে সে মুখ চোরা লাজুক স্বভাবের ছিল, এখন সদ্যযৌবন পেয়ে তার বুকের মধ্যে অনেক কথা জমেছে। তার মা অসুখে ভুগে শয্যাশায়ী হবার পর থেকে সে আর মায়ের সঙ্গ পায় না। এই বৌদিই তার মাতৃসমা। বাড়িতে তার যত কথা সবই বৌদির কাছে।

বাবাও এখন অনেক দূরে সরে গেছেন। কলেজের পলিটিক্স, বন্ধু-বান্ধব, ক্রিকেট—এসব কথাই সে বৌদিকে বলে। আর মাধুরীর মতন এমন শ্রোতাও তো কেউ নেই। মাধুরী প্রিয়ব্রতর সব বন্ধুদের নাম জানে। দু' একজনকে দেখেছেও—বাড়িতে আসে।

প্রিয়ব্রত মুখে ইদানীং দু'একটি মেয়েরও নাম শোনা যায়। তার সহপাঠিনী আছে কয়েকজন, তাছাড়া বন্ধুদের বোন বা আত্মীয়া। এখন সে আর কলকাতা শহরে অচেনা কিশোর নয়, এখন তার বন্ধু-বান্ধবদের একটা পরিমণ্ডল আছে।

মাধুরী বলল, তোর মুখে প্রায়ই রুচিরার কথা শুনি। ওকে একদিন বাড়িতে নিয়ে আয় না!

প্রিয়ব্রত ভুরু কুঁচকে বলল, আমি আবার কখন রুচিরার কথা বললাম?

—প্রায়ই তো বলিস!

—মোটেই না। একটা বাজে মেয়ে। অহঙ্কারে একেবারে মট-মট করছে। ওসব মেয়ে তো ইউনিভার্সিটিতে পড়াশুনা করতে আসে না, শুধু সাজপোশাক দেখাতে আসে। ন্যাকা একটা!

—ছিঃ, প্রিয়, মেয়েদের সম্পর্কে ওরকম ভাবে কথা বলতে নেই।

—তুমি জান না বৌদি, ওরা ইউনিভার্সিটিতে পড়াশুনা করতে আসে না, শুধু সময় কাটাতে আসে। খালি সাজপোশাকের বাহার—আর কার সঙ্গে প্রেম করবে সেই চেষ্টা।

—দেখিস, আবার তোর সঙ্গে করে না তো?

—আমার বয়েই গেছে। আমার অত সময়ই নেই। মেয়েদের নিয়ে রাস্তাঘাটে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়ানো—ওসব আমার পোষাবে না।

—রাস্তা ঘাটে ঘুরে বেড়াতে হবে কেন?

—সবাইকেই তো তাই দেখি। কলকাতার ছেলে-মেয়েদের এইটাই স্বভাব। কোন একটা জায়গায় এসে দেখা করে—তারপর

মাঠে ঘাটে আর রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। ওসব আমার দ্বারা হবে না। বুচিরা আবার এক একদিন এক সঙ্গে ঘোরে।

—আর তোর বন্ধু নবারুনের বোন ঝর্ণা?

—ঝর্ণা? সে তো আর্টস পড়ে—

মাধুরী হেসে বলল, আর্টস পড়া কোন মেয়ের সায়েন্স পড়া কোন ছেলের বন্ধুত্ব হতে নেই?

প্রিয়ব্রত বলল, বন্ধুত্ব আবার কি? মেয়েদের সঙ্গে ছেলেদের বন্ধুত্ব হয় নাকি? ওরা কিছুই খবর রাখে না, কোন একটা সাবজেক্টে ঠিক মতন কথা বলতে পারে না। এমনি নবারুণদের বাড়িতে গেলে কথা-টথা হয় ঝর্ণার সঙ্গে। ও খুব কবিতা-টবিতা নিয়ে কথা বলতে ভালবাসে—আমার তো আবার আর্টসের বই-টই তেমন পড়া হয় না।

কবিতা বুঝি শুধু আর্টসের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য? সবার জন্য। শোন, মেয়েদের সঙ্গে মিশতে হলে একটু কবিতা-টবিতা পড়তে হয়। মনে নেই, জাফরভাই কতরকম কবিতা জানতেন?

সে কি জাফর ভাই মেয়েদের খুশী করার জনাই ওগুলো মুখস্ত করেছিলেন—না, নিজের ভালো লাগতো বলে?

—বোধহয় দুটোই।

—আমার বয়ে গেছে।

কিছুক্ষণ চিকেন চাওমিনে ওরা মনোনিবেশ করল। তারপর ন্যাপকিনে মুখ মুছে মাধুরী মুচকি হেসে বলল, হঠাৎ কোন মেয়েকে যেন বিয়ে করে ফেলিস না। আগে আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিবি—আমরা সবাই দেখব—

প্রিয়ব্রত লজ্জা লুকোতে পারল না। তার ফর্সা মুখ লালচে হয়ে গেল। তবু বিরক্তির ভাব দেখিয়ে বলল, কি আজে-বাজে কথা বলছ! আমি কখনো বিয়েই করব না।

—ধুৎ পাগল বিয়ে করবি না কেন! আমরা সবাই দেখে শুনে

ফুটফুটে একটা মেয়ের সঙ্গে তোর বিয়ে দেব।

—সত্যি বলছি, আমি কোনদিন বিয়ে করব না। ওসব ঝঞ্ঝাট আমার পোষাবে না।

—আচ্ছা সে কথা তোকে এখন ভাবতে হবে না। আমরা ভাবব এখন।

দোকান থেকে বেরুবার পর চমৎকার এক ঝলক হাওয়া ওদের গায়ে এসে লাগে, মাধুরীর আঁচল পতাকার মতন ওড়ে। মাধুরী ব্যস্ত হয়ে শাড়ি সামলায়। মাধুরী আজ একটা সরুপাড় সাদা শাড়ি আর সাদা ব্লাউজ পরেছে, শরীরে কোন অলংকার নেই বলতে গেলে। তবু তার স্নিগ্ধ রূপে এক নজরেই চোখে পড়ে।

চাঁদ ঢেকে গেছে মেঘে। ময়দানের গাছপালার মাথার ওপর দিয়ে শোঁ শোঁ করে ছুটে এল ঝড়। ওরা ট্যাক্সি খোঁজার আগেই হুড়মুড় করে নেমে পড়ল বৃষ্টি। কাছাকাছি কোন আচ্ছাদন নেই। দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়েও ওরা বৃষ্টির ছাট এড়াতে পারল না—এত তেজী বৃষ্টি।

দূরে একটা গাড়ি-বারান্দা। প্রিয়ব্রত জিজ্ঞেস করল, বৌদি, ঐখানে যাবে?

—যেতে যেতেই ভিজে যাব যে।

প্রিয়ব্রত মাধুরীর একটা হাত চেপে ধরে বলল, দৌড়াও!

বৃষ্টির মধ্যে সমস্ত রাস্তা ফাঁকা। দৌড়তে দৌড়তে ওরা এল গাড়ি বারান্দার নিচে। সেখানে বিশেষ মানুষজন নেই, শুধু কয়েকজন ফেরিওয়ালা আশ্রয় নিয়েছে। ওরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বৃষ্টি দেখতে লাগল। এইটুকু আসতেই ওরা যথেষ্ট ভিজে গেছে! দু'গাল বেয়ে টপ-টপ করে পড়ছে জল।

একজন ফেরিওয়ালা নৈরাশ্য কাটাবার জন্য কয়েকটা বেল ফুলের মালা নিয়ে এসে মাধুরীকে বলল, মা কিনবেন? টাটকা—একদম টাটকা!

মাধুরী বলল, না।

ফেরিওয়ালাটি তখন প্রিয়ব্রতর কাছে এসে বলল, বাবু নিন না। সস্তা করে দিচ্ছি।

মালাগুলো একেবারে প্রিয়ব্রত নাকের কাছে এনে ধরেছিল বলে গন্ধের ঝাপটা লাগল তার নাকে। প্রিয়ব্রতর বেশ ভালই লাগল। মাধুরীর দিকে তাকিয়ে বলল, নাও না! উত্তরের অপেক্ষা না করেই প্রিয়ব্রত কিনে ফেলল দুটো মালা। বৌদির দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, এই নাও।

মাধুরী ঘাড় নেড়ে বলল, না।

—নাও না, খোঁপায় পড়ে নাও। বেশ ভাল দেখাবে।

—দরকার নেই। তোর কাছেই রাখ!

প্রিয়ব্রত জোর করে মাধুরীর চুলে জড়িয়ে দিল মালা। মাধুরী বাধা দিতে গেলে প্রিয়ব্রত শক্ত করে চেপে ধরল তার কাঁধ। হাসতে হাসতে বলল, তুমি আমার সঙ্গে গায়ের জোরে পারবে? এখন আর পারবে না।

তারপর মাধুরীকে ছেড়ে দিয়ে বলল, বাঃ দেখ তো, কি সুন্দর দেখাচ্ছে!

—দূর, আমাকে কি এসব মানায়? বুড়ি হয়ে গেছি!

—হ্যাঁ, সাত বুড়ির এক বুড়ি। বুড়ি থুত্থুড়ি। দেখি দেখি বুড়ির মুখখানা দেখি।

প্রিয়ব্রত আঙুল দিয়ে মাধুরীর থুতনিটা ধরে ইয়ার্কি করতে লাগল। তারপর বলল, বৌদি, তুমি আজকাল শুধু সাদা শাড়ী পর কেন? তোমার অন্য শাড়ীগুলো সব কোথায় গেল?

—রঙীন শাড়ীগুলো সব তুলে রেখেছি। তার বৌ এলে তাকে দেব।

—বাজে কথা বল না। কাল থেকে তুমি সেই সব শাড়ী আবার পরবে। স্কুলে তুমি এই ভাবে যাবে না।

—তোর হুকুম বুঝি?

—হ্যাঁ, হুকুমই তো!

—আমার আর সত্যিই ভাল লাগে না রে। আমার তো এখন মাছ-মাংস খেতেই কি রকম যেন অস্বস্তি হয়।

প্রিয়ব্রত হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। ম্লান গলায় বলল, বৌদি তুমি এরকম কথা বললে আমার কষ্ট হয়। আর বলবে না বল?

—তুই ছেলেমানুষ, তুই বুঝবি না।

—মোটেই আমি ছেলেমানুষ নই। বল, আর বলবে না?

—আচ্ছা বলব না।

বৃষ্টি থামবার লক্ষণ নেই। এখান থেকে ট্যাক্সি ডাকলেও থামছে না। প্রিয়ব্রত একজায়গায় বেশীক্ষণ থাকতে পারে না। সে ছটফট করছে। এক সময় বলল, চল বৌদি, একটু এগিয়ে যাই। শুধু শুধু কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকব?

—ভীষণ জোর বৃষ্টি পড়ছে। একেবারে ভিজে যাব যে!

এমনিতেই তো ভিজে গেছি। তোমার বৃষ্টি ভিজতে ভাল লাগে না?

গাড়ি বারান্দা ছেড়ে দুজনে আবার বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়। গাড়িগুলো দ্রুত ছুটে যাচ্ছে—রাস্তায় এমনি মানুষজন নেই। রাত ক্রমশ গভীর হচ্ছে। বৃষ্টি অগ্রাহ্য করে ওরা পাশাপাশি হাঁটতে লাগল আস্তে আস্তে।

প্রচণ্ড শব্দ করে বিদ্যুৎ চমকালো। সেই বিদ্যুতের আলোয় মাধুরী তাকাল প্রিয়ব্রতর মুখের দিকে। হঠাৎ চমকে উঠল সে। সেই ঝড় বৃষ্টির রাতে প্রিয়ব্রতর মুখের দিকে চেয়ে মাধুরী কি দেখলো কে জানে মনে হলো যেন এই প্রিয়ব্রতর তার অচেনা।

॥ ৫ ॥

সায়েন্স কলেজের গেটের সামনে প্রিয়ব্রত তার বন্ধুদের সঙ্গে দাঁড়িয়েছিল। ক্লাস শেষ হয়ে গেছে একটু আগে। এক্ষুনি বাড়ি না ফিরে ওরা কফি হাউসে গিয়ে বসবে কিংবা একটা সিনেমা দেখতে যাবে—এই নিয়ে আলোচনা হচ্ছে।

নবারুণ বলল, হেভি খিদে পেয়েছে মাইরি, আগে চল আমজাদিয়ায় গিয়ে সস্তায় কিছু মাংস খাওয়া যাক।

সঞ্জয় বলল, তাহলে আর সিনেমার টিকিট পাওয়া যাবে না।

—ধ্যাৎ তেরি সিনেমা। পেটে এখন ছুঁচোয় ডন মারছে। কি রে প্রিয়ব্রত, তোর খিদে পায় নি?

নতুন যৌবন, ওদের সবারই এখন খিদে বেশী পায়। কিন্তু সেটা চেপে রাখাও একটা নেশা। আবার এক কাপ চা কিংবা কফি খেলেই তো খিদে মরে যাবে। কফি হাউসে যাওয়াই ঠিক হল।

রাস্তার উল্টোদিকে দুটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে বাস ধরবার জন্য। ওদের সহপাঠিনী। রুচিরা আর শিপ্রা।

সেইদিকে তাকিয়ে সঞ্জয় বলল, আমাদের গার্লফ্রেন্ডদের সঙ্গে নিয়ে গেলে কি রকম হয়?

নবারুণ ঠাট্টা করে বললো, কবে থেকে ওরা তোর গার্লফ্রেন্ড হলো রে ক'দিন কথা বলেছিস?

—মনে মনে ভেবে নিলেই তো হলো।

নবারুণ বলল, কোন আপত্তি নেই, যদি ওদের ঘাড় ভেঙে খাওয়া যায়।

—মেয়েদের কাছ থেকে পয়সা বের করতে পারবি? তাহলেই হয়েছে!

রুচিরার কাছে অনেক টাকা থাকে।

—থাকলেই বা। খুব টাইট পার্টি।

—তোরা যদি রুচিরাকে কফি হাউসে যাবার জন্য রাজী করাতে পারিস্—তাহলে আমরা ওর পয়সায় খাব। সে রিস্ক আমার!

—কক্ষনো পারবি না।

—বাজি?

—রুচিরা যাবেই না আমাদের সঙ্গে। সুভদ্র থাকলে হয়তো যেত। সুভদ্রের সঙ্গে রুচিরার একটা লাইন আছে।

—প্রিয়ব্রত গিয়ে বললে হতে পারে। প্রিয়ব্রতর লালটু চেহারা আছে।

—প্রিয়ব্রত, যা না—

প্রিয়ব্রত বলল, না ভাই, আমি পারব না। আই ডোণ্ট লাইক দ্যাট গার্ল।

—হোয়াই? রুচিরার ফিগারটা দারুণ। হাঁটার সময় লক্ষ্য করেছিস, পেছনটা কি রকম এদিক ওদিক—

প্রিয়ব্রত সঞ্জয়কে বলল, তুই যা না, তোর তো ওকে খুব পছন্দ।

সঞ্জয় বলল, পছন্দ হলেই বা, আমার ভাই ওদিকে নো হোপ। সুভদ্রর সঙ্গে চেহারার কম্পিটিশানে পারব না।

বন্ধুরা শেষ পর্যন্ত এরকম ঠেলে-ঠুলেই প্রিয়ব্রতকে পাঠাল। যাবার সময় সঞ্জয় বলে দিল, শিপ্রাটাকে কাটাবার চেষ্টা করিস। ও বড্ড গোমড়ামুখো।

প্রত্যেক ডিপার্টমেন্টেই একটি কোন বিশেষ মেয়ের দিকে অধিকাংশ ছেলের দৃষ্টি থাকে। কিন্তু রুচিরা শুধু কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টেই নয়—গোটা সায়েন্স কলেজেই এ বছর সে মিস ইউনিভার্সি নামে পরিচিত। খুব সুন্দরী সে নয়, কিন্তু শরীরে বেশ একটা চমক আছে। সাধারণ মেয়েদের তুলনায় একটু বেশী লম্বা গায়ের রং খুব ফর্সা না হলেও তার চামড়া মসৃণ উজ্জ্বল। তাছাড়া তার মুখ-চোখে একটা অহংকারী ভঙ্গি, উগ্র সাজপোশাক করে ক্লাসে

আসতে সে লজ্জা পায় না। যদিও পড়াশোনাতেও বেশ ভাল, রুচিরা বি, এস, সিতে ফার্স্টক্লাস অনার্স পেয়েছিল।

প্রিয়ব্রতকে রাস্তা পেরিয়ে এপার আসতে দেখে রুচিরা চোখ ফিরিয়ে নিল না। সোজাসুজি তাকিয়ে রইল প্রিয়ব্রতর দিকে। কাছে আসতে সে নিজে থেকেই বলল, কি?

প্রিয়ব্রত একটু নার্ভাস হয়েছে। যতদূর সম্ভব সপ্রতিভ হবার চেষ্টা করে বলল, আপনারা কোনদিকে যাচ্ছেন?

—বাড়ির দিকে।

—এক্ষুনি বাড়ি ফিরে কি করবেন? চলুন, একটু কফি হাউসে গিয়ে বসা যাক্।

রুচিরা ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, কফি হাউসে আমার বিচ্ছিরি লাগে। চেঁচামেচি হয়।

প্রিয়ব্রত আর বিশেষ গরজ দেখাল না। বলল, যাবেন না? আমরা যাচ্ছিলাম, ঠিক আছে।

তারপর সে শিপ্রার দিকে তাকিয়ে বলল, আপনি যাবেন?

শিপ্রার চেহারা সাদামাটা এবং লাজুক! সে উত্তর না দিয়ে রুচিরার মুখের দিকে তাকাতে অনুমতি দিয়ে বলল, তুই যেতে পারিস। শিপ্রা তখন বলল, তুই গেলে আমি যেতে পারি।

রুচিরা বলল, নাঃ, আমি কফি হাউসে যাব না। অন্য কোথাও বসতে পারি একটু?

প্রিয়ব্রত বলল, না, আমরা কফি হাউসেই যাচ্ছি। চলি!

প্রিয়ব্রত ফিরে হাঁটতে শুরু করেছিল, রুচিরা ডাকল, শুনুন! হাউসে যেতে পারি। আপনি খাওয়াবেন তো?

—হিজ হিজ হুজ হুজ!

—আমার কাছে পয়সা টয়সা নেই।

—তাহলে যেতে হবে না।

রুচিরা এবার প্রিয়ব্রতর কাছে এগিয়ে এসে বলল, আপনি এরকম

অসভ্য কেন ভালভাবে কথা বলতে পারেন না?

—খারাপ ভাবে তো কিছু বলিনি। আপনার কফি হাউসে যেতে ইচ্ছে না করে তো যাবেন না। আমি কি জোর করে নিয়ে যাব নাকি! জোর করে কি আড্ডা মারা যায়?

আর কথা না বলে প্রিয়ব্রত রাস্তা পেরিয়ে চলে এল। বন্ধুদের বলল, আসবে না ভাই, চল্।

নবারুণ বলল, পারলি না আনতে? তুই একটা হোপলেস। সুভদ্র থাকলে ঠিক আসত!

ওঁরা হাঁটতে লাগল কফি হাউসের দিকে। মাথার ওপর চড়া রোদ, ওদের ভ্রুক্ষেপ নেই। মেয়েদের কথা অবিলম্বে ভুলে গিয়ে ওরা রাজনীতির কথায় মগ্ন হয়ে গেল। পুড়তে লাগল সিগারেট।

কফি হাউসের তিনতলায় এসে ওরা অবাক হয়ে দেখল আগে থেকেই রুচিরা আর শিপ্রা বসে আছে একটা টেবিলে। ওরা বাসে এসেছে তাই আগে এসেছে। মন দিয়ে খাচ্ছে চিকেন ওমলেট।

আর কোন টেবিল খালি নেই। নবারুণই এগিয়ে গিয়ে বলল, কি আমরা এখানে বসতে পারি?

রুচিরা আলগা ভাবে বলল, স্বচ্ছন্দে।

তিনটে চেয়ার টেনে নিয়ে ওরা বসল। প্রিয়ব্রত একটু ব্যঙ্গের সুরে রুচিরাকে বলল, কি, একটু আগে যে বললেন, কফি হাউস আপনার বিচ্ছিরি লাগে। তা-ও এলেন যে?

রুচিরা মুখ তুলে বলল, ইচ্ছে হল তাই এলাম!

—আপনার ইচ্ছে দেখছি ঘন ঘন বদলায়।

—হ্যাঁ।

সঞ্জয় বলল, এই রুচিরা, আমাদের একটা করে চিকেন ওমলেট খাওয়াবে? দারুণ খিদে পেয়েছে।

—আমার কাছে পয়সা নেই। নিজেদের পয়সায় খাও না, হিজ হিজ হুজ হুজ!

সঞ্জয় খপ করে রুচিরার হাত-ব্যাগটা তুলে নিয়ে বলল, দেখি টাকাপয়সা আছে নাকি? উরেঃ ম্যাইরি, তিনটে দশ টাকার নোট।

—ও টাকার আমার অন্য দরকার আছে। খাওয়াতে পারব না।

সঞ্জয় সে কথা গ্রাহ্য না করে বলল, ধার ধার! এখন পে করে দাও, পরে শোধ করে দেব।

সঞ্জয় আঙুলের টুসকি দিয়ে বেয়ারাকে ডেকে বলল, আউর তিনঠো চিকেন ওমলেট। জলদি।

প্রিয়ব্রত বলল, আমি খাব না। আমি শুধু কফি।

রুচিরা ফিক করে হেসে বলল, আপনি খাবেন না? যাক্, তাও কিছু পয়সা বাঁচল।

শিপ্রা মুখ নিচু করে আছে। তার এখানে কিছুই বলার নেই।

নবারুণ আর শিপ্রার মাঝখানে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, সুভদ্র আজ এল না কেন? উত্তরটা সে রুচিরার কাছ থেকে আশা করেছিল, কিন্তু রুচিরা মুখটা ফিরিয়ে নিল। টেবিলের তলায় সঞ্জয় নবারুণের পায়ে একটা লাথি মেরে বোঝাল। এখানে শুভদ্র প্রসঙ্গ না তোলাই ভাল, রুচিরা রেগে যাবে।

সঞ্জয় সিগারেট প্যাকেট বার করে নিজে ধরাবার আগে প্যাকেটটা রুচিরার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, চলবে?

রুচিরা বলল, নো, থ্যাঙ্কস!

—কেন, তোমাকে তো সিগারেট খেতে দেখেছি। সেই পিকনিকে···

—খাই না তো বলি নি। এখন ইচ্ছে করছে না!

—নাকি ভয় পাচ্ছ, কফি হাউসে এত লোকের সামনে—

—ভয়ের কি আছে!

—তাহলে এখানে একটা খাও, বুঝব সাহস।

—যদি অন্য ছেলেরা আওয়াজ দেয়?

সাহসের সঙ্গে খেতে পারলে কেউ আওয়াজ দেবে না।

রুচিরা একটা সিগারেট তুলে নিল। সঞ্জয় শিপ্রাকে জিজ্ঞেস করল, আপনি?

শিপ্রা একেবারে লজ্জায় কুঁকড়ে গিয়ে বলল না, না, আমি না।

দূরের টেবিলে প্রিয়ব্রতর একটি চেনা ছেলে বসেছিল—সে হাত তুলে ডাকতে প্রিয়ব্রত এই টেবিল ছেড়ে উঠে গেল। ফিরে এল একটু পরে। রুচিরা তার সিগারেটের শেষ অংশটুকু অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিয়ে প্রিয়ব্রতকে জিজ্ঞেস করল, আপনি হঠাৎ টেবিল থেকে উঠে গেলেন যে? এটা ব্যাড ম্যানার্স।

—ওখান থেকে একজন ডাকল।

—মোটেই তা নয়। আপনি মেয়েদের সিগারেট খাওয়া পছন্দ করেন না, তাই এই সময়টুকু আমার সামনে বসতে চান নি।

প্রিয়ব্রত রেগে গেল। ঝাঁঝালো গলায় বলল, আজ এ ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট আমি সত্যি মেয়েদের সিগারেট খাওয়া পছন্দ করি না। আমার দেখতে খারাপ লাগে।

রুচিরা বলল, আপনাদেরও অনেক কিছু আমরা পছন্দ করি না। কিন্তু মুখে তা বলি না।

—যেমন?

রুচিরা স্পষ্ট ইঙ্গিতের সঙ্গে বুকের আঁচল ঠিক করে বলল, আপনি মেয়েদের দিকে বিচ্ছিরি ভাবে তাকান।

লজ্জায় প্রিয়ব্রতর মুখ চোখ লাল হয়ে গেল। সে তক্ষুনি কি উত্তর দেবে ভেবে পেল না। তাকে বাঁচাতে এল সঞ্জয়। সে বলল, শুধু প্রিয়ব্রতর নামে একা দোষ দিচ্ছ কেন? সবাই টেরিয়ে টেরিয়ে তাকায় মেয়েদের দিকে, ও না হয় তাকায় একটু সোজাসুজি। এতে দোষের কি আছে? আর তোমরা মেয়েরাই বা কি—সব সময় অত ঢেকে-ঢুকে রাখো কেন—মাঝে মাঝে একটু এলোমেলো হয়ে থাকলে আমরা একটু চোখ ভরে দেখে নিতে পারি। একটু দেখলে তা আর কিছু ক্ষয়ে যাচ্ছে না।

শিপ্রা চোখ বড় বড় করে শুনছে। রুচিরা চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, ভেরি স্মার্ট, অ্যাঁ? তোমার ধারণা, খুব একটা স্মার্ট কথা বললে, তাই না?

সঞ্জয় বলল, আমি ভাই খোলাখুলি বলছি। আমাদের যথেষ্ট বয়েস হয়েছে, আমাদের সকলেই সেক্সুয়াল নীড আছে। কেম্ব্রিজ হার্ভার্ড কিংবা বার্কলের ছাত্র-ছাত্রীরা আজকাল একসঙ্গে শোয়—কলেজ অথরিটিও মাইন্ড করে না। কিন্তু আমাদের শালা কি অবস্থা! একটু চোখের দেখা দেখব—তাতেও এত দোষ!

—কেম্ব্রিজ হার্ভার্ডে গেলেই পারতে!

—সামর্থ থাকলে ঠিকই যেতাম।

—আরও অনেক কিছুরই সামর্থ নেই তোমাদের।

—একবার চান্স দিয়ে দেখোই না।

—এই, কি হচ্ছে কি?

সঞ্জয় পুরো গলায় হাসল। হাসতে হাসতে বলল, দোষের কিছু বলেছি? ছেলেদের দরকার মেয়েদের। মেয়েদের দরকার ছেলেদের। অথচ সবারই পেটে খিদে মুখে লাজ। আজকাল এত রকম কনট্রাসেপটিভ বেরিয়েছে—তবুও মাইরি বিয়ে না করলে ওসব কিছু হবে না। এর কোন মানে হয়? এখনও ওল্ড সুপারস্টিশান অফ সতীত্ব। সেইজন্যই তো বাথরুমে সময় নষ্ট, মেয়েদের পেছনে ছুঁক-ছুঁক করে সময় নষ্ট—

প্রিয়ব্রত তাকিয়ে ছিল শিপ্রার দিকে। শিপ্রা এমনিতে এত লাজুক ও সাধারণ, কিন্তু সঞ্জয়ের কথা সে শুনছে দারুণ একাগ্র ভাবে, বেশ উপভোগ করছে মনে হয়। যেন সঞ্জয়ের প্রতিটি কথায় তার সম্মতি আছে। রুচিরার মুখে লজ্জা কিংবা রাগের চিহ্নমাত্র নেই—সে আঙুল দিয়ে টেবিলের ওপর গড়ানো জলে ছবি আঁকছে।

প্রিয়ব্রত সঞ্জয়কে বলল তুই একটা কথা ভুলে যাচ্ছিস! ভালোবাসা বলেও একটা ব্যাপার আছে। ভালোবাসা ছাড়া—

এবার সঞ্জয় কিছু বলার আগেই নবারুণ বলল, ওসব ভালোবাসা-টালোবাসা এ-যুগে বরবাদ হয়ে গেছে। সোস্যালিজমের যুগে ভালোবাসা অচল। সবাইকে চান্স দিতে হবে তো! কলকাতা শহরে মেয়ের তুলনায় ছেলে অনেক বেশী। আমাদের ক্লাসের কথাই ধর না—সাত জন মোটে মেয়ে—আর ছেলে ছত্রিশ জন। সবাই ভালোবাসতে চাইলেও চান্স পাবে? এক যদি মেয়েরা দ্রৌপদী হতে রাজী হয়।

সঞ্জয় বলল, তার ওপর, আমাদের মতন যাদের চেহারা ঠিক প্রেমিক টাইপের নয়—

শিপ্রা হাসি লুকোতে পারল না। রুচিরা ব্যাগটা তুলে নিয়ে বলল, আমি এবার উঠব।

সঞ্জয় তার হাত চেপে ধরে বলল, আরে, রাগ করছ কেন? এ তো থিয়োরিটিক্যাল আলোচনা হচ্ছে। নাথিং পার্সোনাল।

—আমাকে এবার যেতে হবে।

—দাঁড়াও, আগে বেয়ারা বিল দিক। পয়সা না দিয়ে কোথায় যাচ্ছ?

প্রিয়ব্রত বলল, আপনার যদি বিশেষ তাড়া থাকে, আপনি চলে যান আমি বিল মিটিয়ে দেব—আমার কাছে আছে।

রুচিরা বলল, ধন্যবাদ। তার দরকার হবে না।

ব্যাগ থেকে সে একটা দশটাকার নোট বার করে টেবিলের ওপর রাখল।

সঞ্জয় বলল, ভাই রুচিরা, বেশী রাগ-ফাগ কোর না। তোমার অনেক আছে—তার থেকে মাঝে মাঝে যদি আমাদের ছিঁটে-ফোঁটা দাও, আমরা বর্তে যাব।

নবারুণ বলল, তা হলে আর এক রাউন্ড কফি হয়ে যাক?

সঞ্জয় তাকে মুখঝামটা দিল, ধ্যাৎ ইডিয়েট। আমি শুধু টাকা পয়সার কথা বলিনি।

—তা হলে কি সেই দ্রৌপদী হবার কথা বলছিস?

—একজ্যাক্টলি! সব মেয়েরই আজকাল দ্রৌপদী হওয়া উচিত—না হলে আমাদের মতন নকুল-সহদেবের কি হবে বল?

রুচিরাও এবার হাসল। হাসতে হাসতে বলল, তুমি সায়েন্স না পড়ে বাংলা পড়লে পারতে। বাংলা ডিপার্টমেন্টে ছেলেদের থেকে মেয়ে বেশী। চান্স পেতে!

সঞ্জয় দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, বাংলার মেয়েরা খুব চোখা চোখা কথা বলতে পারে, আসল কাজের বেলায় কিছু না। বাংলা ডিপার্টমেন্টের একটা মেয়ের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল, শুধু কথা, শুধু কথা। এদিকে বৈষ্ণব পদাবলী মুখস্থ করছে—কিন্তু পরকীয়া প্রেমের কথা শুনলেই আক্কেল গুড়ুম।

॥ ৬ ॥

নবারুণদের বাড়ি পার্ক সার্কাসে। নবারুণের বাবা নেই। দুই দাদা সংসার চালান। বড়দাদা একজন উৎসাহী রাজনৈতিক কর্মী, ডঃ গণির নির্বাচনের সময় খুব খাটাখাটনি করেছেন। মেজদা মাস মাসখানেক আগে ব্যাঙ্কের চাকরিতে বদলি হয়েছেন পাটনা—সস্ত্রীক সেখানে গেছেন। বাড়ি অধিকাংশ সময়ে ফাঁকাই থাকে বলে—নবারুণের বন্ধুদের আড্ডা এখানে জমে প্রায়ই। প্রিয়ব্রত মাঝে মাঝে আসে।

সেই রকম এক শনিবার বিকেলে নবারুণের বাড়িতে বন্ধুদের জমায়েত হবার কথা, প্রিয়ব্রত একা চলে এল বাড়ি থেকে। এসে দেখল সেখানে কেউ নেই, এমন কি নবারুণও বাড়িতে নেই।

প্রিয়ব্রত অবাক হয়ে গেল। অনেকেরই আসবার কথা, অথচ কেউই আসে নি—

—এটা বড় অদ্ভুত। সে কি অপেক্ষা করবে, না চলে যাবে?

নবারুণের বোন ঝর্ণা বলল, বসুন না। দাদা একটু পরেই আসবে।

প্রিয়ব্রত নবারুণের পড়বার ঘরে এসে বসল। একখানা বই হাতে নিয়ে চেয়ার থেকে পা তুলে দিল টেবিলে। একটু বাদেই বইখানার মধ্যে ডুবে গেল।

কতক্ষণ সময় কেটে গেছে তার খেয়াল নেই, আকাশ মেঘলা করে অন্ধকার হয়ে এসেছে। তারপর বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে ঘরে ঢুকছে জলের ছাট—প্রিয়ব্রত জানালা বন্ধ করে নি।

ঝর্ণা ঘরে ঢুকে প্রিয়ব্রতকে ধমক দিয়ে বলল, সব ভিজে গেল যে। জানলা বন্ধ করতে পারেন নি? আর এই অন্ধকারের মধ্যে কেউ বই পড়ে? অত পড়াশুনোয় মনোযোগ দেখাতে হবে না!

প্রিয়ব্রত বই মুড়ে রেখে বলল, ওরা তো কেউ এল না দেখছি। আমি তা হলে উঠি?

—এই বৃষ্টির মধ্যে যাবেন কি করে?

—ভিজতে ভিজতে যাব।

—ভিজতে আপনার ভালো লাগে?

—ভালোও লাগে না, খারাপও লাগে না।

—ঠিক আছে, যান তা হলে বেরিয়ে পড়ুন।

প্রিয়ব্রত এবার ঝর্ণার দিকে ভালো করে তাকাল। চুল খোলা, এলোমেলো ভাবে শাড়ি পরা—ঠোঁটের কোণে চাপা হাসি। বাইরে বৃষ্টি মেশা ঝড়ের আওয়াজ হচ্ছে দড়াম দড়াম করে।

প্রিয়ব্রত জিজ্ঞেস করল, বাড়িতে তুমি একা?

—হুঁ।

—আমি চলে গেলে তারপর কি করবে? কবিতা পড়বে?

ঝর্ণা হাসতে হাসতে বলল, না হলে কি আপনার সঙ্গে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরব নাকি বৃষ্টির মধ্যে?

—তুমি যদি চা খাওয়াও, আমি আর একটু বসতে পারি।

—আপনাকে বসবার জন্য তো মাথার দিব্যি দিই নি।

—চা খাওয়াবে কি না বল না?

—রাঁধুনি এখনও ঘুম থেকে ওঠে নি। এখন চা হবে না।

—তুমি নিজে চা করতে পার না?

—বাবারে বাবা! বসুন, আসছি।

ঝর্ণা চা আনতে যাবার পরই প্রিয়ব্রত ভাবল, চায়ের জন্য এতটা পেড়াপেড়ি না করলেও হত। তার বেরিয়ে পড়াই উচিত ছিল। বৃষ্টি থামার লক্ষণ নেই। চেয়ারে বসে সে আবার এ বই সে বই পাল্টাচ্ছে।

দু'কাপ চা এনে টেবিলে রেখে ঝর্ণা বসল প্রিয়ব্রতর মুখোমুখি। চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, ধুৎ, বৃষ্টি হলে আমার মেজাজ খারাপ হয়ে যায়।

প্রিয়ব্রত বলল, সেকি বৃষ্টি পড়লেই তো শুনেছি কবিতা-টবিতা ভাল লাগে।

—বৃষ্টি পড়লে আমার বিচ্ছিরি লাগে।

—একটা কিছু কবিতা শোনাও না।

—বেরসিকের সামনে কবিতা পড়া যায় না।

আস্তে আস্তে শিখব। আমাকে একটু বুঝিয়ে দাও।

—আমার অত ধৈর্য নেই।

প্রিয়ব্রত হঠাৎ খুব অস্বস্তি বোধ করল। সে কোন কথা খুঁজে পাচ্ছে না। অথচ কিছু যেন বলা উচিত। আধো-অন্ধকার ঘর, বাইরে বৃষ্টির একটানা শব্দ সামনে তার দৃষ্টির সীমা জুড়ে বসে আছে একটি নারী। তার গা থেকে একটা মিষ্টি গন্ধ আসছে। আঁচল সরে গেছে সামান্য। ব্লাউজের একটা বোতাম খোলা—ভেতরে ব্রা দেখা যাচ্ছে। এই সময় কিছু যেন বলা উচিত। কি? প্রিয়ব্রত জানে না।

টেবিলের ওপর ঝর্ণার একখানা হাত রাখা। নোখে রক্ত-কুমকুম মাখানো। প্রিয়ব্রত অবচেতন ভাবে তার ডান হাত রাখল সেই হাতের ওপর। ঝর্ণা হাত সরিয়ে নিল না। প্রিয়ব্রত তখন সেই হাতখানা কাছে টেনে এনে বলল, বাঃ তোমার আঙুলগুলো তো বেশ সুন্দর। তুমি কি সেতার বাজাও? শিল্পীদের আঙুল এইরকম হয়।

ঝর্ণা অকারণে দুষ্টুমির হাসি খেলাল ঠোঁটে। তারপর বলল, না, আমি সেতার বাজাই না। আমি শিল্পীও নই।

—তোমার আঙুলগুলো সত্যিই সুন্দর।

—তাই বুঝি?

প্রিয়ব্রত চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

ঠিক যেন ছোটছেলেকে বকুনি দিচ্ছে, এইভাবে ঝর্ণা বলল, উঠলেন কেন, বসুন।

প্রিয়ব্রত গ্রাহ্য করল না। সে ঝর্ণার দিকে এগিয়ে গেল। ঝর্ণাও তখন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে রুক্ষ গলায় বলল, কি হচ্ছে কি?

ঝর্ণা দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, প্রিয়ব্রত তাকে সুযোগ দিল না—দ্রুত কয়েক লাফে সে আগেই পৌঁছে গেল দরজার কাছে—ঝর্ণার দু'বাহু চেপে ধরে, টেনে আনল দেয়ালের কাছে।

প্রিয়ব্রতকে তখন দেখলে মনে হয় অন্ধ। কেন না তার দৃষ্টি স্থির। তার মুখের রংটা অদ্ভুত ধরনের লালচে, এরকম রং তার আগে কখনো দেখা যায় নি!

ঝর্ণা খুব শান্ত ভাবে বলল, ছেড়ে দিন।

প্রিয়ব্রত মুখ নিচু করে ঝর্ণার চুলের গন্ধ নিতে লাগল। একটা হাতে ঝর্ণার কোমরের কাছে শক্ত করে ধরে অন্য হাতে ঝর্ণার থুতনিটা উঁচু করে ধরল।

ঝর্ণা একটুও বিচলিত হয় নি। জোর করে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবারও চেষ্টা করল না। প্রতীক্ষার চোখে তাকিয়ে রইল।

প্রিয়ব্রত বলল, তুমি তখন থেকে আমাকে অপমান করার চেষ্টা করছ কেন?

ঝর্ণা মুচকি হেসে বলল, করেছি বুঝি? বেশ করেছি!

—আমাকে ভয় করে না তোমার?

—আপনাকে কিসের ভয়?

এরপর ঝর্ণাকে চুম্বন করাই স্বাভাবিক ছিল প্রিয়ব্রতর পক্ষে। প্রিয়ব্রত কোন অনাত্মীয়া নারীকে এরকমভাবে আলিঙ্গন করে নি আগে কখনো! আজ সে যা করছে এটাও যেন তার নিজের ইচ্ছেয় নয়—এই তুমুল বৃষ্টি ও নির্জন ঘরের ষড়যন্ত্রই এ জন্য দায়ী! এবং ঝর্ণার ভয় না-পাওয়া মুখ ও ব্লাউজের একটা বোতাম খোলা।

কিন্তু মানুষের হৃদয়ের অলিগলিতে অনেক রহস্য! যা স্বাভাবিক তা তো সব সময় হয় না। চুম্বনের বদলে ঝর্ণাকে ভয় দেখানোরই সাধ জাগল প্রিয়ব্রতর। সে ঝর্ণার মসৃণ গালে একটা চড় কসাল জোরেই।

ঝর্ণা তীব্র চোখে তাকাল প্রিয়ব্রতর দিকে। ঠোঁটের কোণের হাসিটা মুছে গেল খুব আস্তে আস্তে! বলল, ছাড়ুন এবার! কেউ

এসে পড়ে দেখে ফেললে কি ভাববে?

—তুমি আমাকে ভয় পাও না?

—ছাড়ুন বলছি!

যেন প্রিয়ব্রতর নিয়তি তাকে নির্দেশ দিচ্ছে, এইভাবে সে আবার বেশ জোরে চড় মারল ঝর্ণাকে। এবার ঝর্ণার মুখখানা লাল হয়ে গেল। দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে এল তার চোখ দিয়ে। আপনি এরকম করছেন কেন?

—তুমি আমাকে অপমান কর কেন?

—কি অপমান করেছি?

—আমি যতবার তোমাদের বাড়িতে আসি, তুমি গ্রাহ্যই কর না আমাকে। আমি কবিতা-টবিতা বুঝি না বলে আমাকে মানুষ বলেই গ্রাহ্য কর না।

—বেশ করি!

ঝর্ণা আর সময় দিল না প্রিয়ব্রতকে। মুখখানা এগিয়ে এনে প্রিয়ব্রতর বুকের খোলা জায়গায় কামড়ে ধরল।

ব্যথা পাওয়ার বদলে প্রিয়ব্রতর সমস্ত শরীর অসহ্য সুখে ভরে গেল। আঙুলের ডগায় উত্তাপ। দু'হাত দিয়ে চেপে ধরল ঝর্ণাকে। ঝর্ণা মুখ তুলে তৃষ্ণার্তের মতন ব্যাকুলভাবে খুঁজে খুঁজে এবার তার ঠোঁট ডুবিয়ে দিল প্রিয়ব্রতর ঠোঁটে। যেন পরস্পর পরস্পরের আত্মা শুষে নেবে।

একটু বাদেই দুজন দুজনকে ছেড়ে একটু দূরে সরে দাঁড়াল। এখন দু'জনের চোখেই ঝিকমিক করছে লজ্জা ও সুখ মেশানো এক ধরনের আলো।

একটা কিছু তো বলতে হবে, তাই প্রিয়ব্রত বলল, আমি কিন্তু তোমাকে ভালবাসি না!

ঝর্ণা অবজ্ঞার হাসি হেসে বলল, কে চায় আপনার ভালবাসা?

—তুমি অন্য কারুকে ভালোবাসো?

—তা জেনে আপনার দরকার ?

—আমি কোন মেয়েকেই ভালবাসি না !

—আপনার সে ক্ষমতাই নেই ।

—কারুকে ভালবাসলে তাকে বিয়ে করতে হয় ।

—তাই তো, দারুণ সমস্যা ।

—তা হলে ?

—বৃষ্টি থেমে এসেছে, এবার চলে যান ।

—যদি না যাই ?

—গেট আউট !

—আবার আমাকে অপমান করছ ?

প্রিয়ব্রত আবার রাগী চোখে তাকাল । ঝর্ণা সেটা বেশ উপভোগ করে খিলখিলিয়ে হেসে উঠল বাচ্চা মেয়ের মতন ।

বৃষ্টিমগ্ন দুপুরের এই নির্জন ঘরে এই দুটি যুবক-যুবতীকে অন্য কেউ দেখলে পাগল ছাড়া কিছু ভাববে না । এদের কথাবার্তা যেমন অদ্ভুত, তেমনই এদের ব্যবহারেরও কোন মিল নেই ।

পরস্পরের চোখের দিকে স্থির ভাবে চেয়ে রইল কয়েক পলক । তারপর ঝর্ণাই ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল প্রিয়ব্রতর বুকে । ঠোঁটে ও ঘাড়ে চুম্বনে চুম্বনে দুজনে যেন সত্যিই পাগল হয়ে উঠল । ওরা যা ভোগ করছে, তার নাম আনন্দ । আজ থেকে তিরিশ বছর বাদে সে আনন্দ ওদের জীবন থেকে অদৃশ্য হয়ে যাবে । ওরা অবশ্য ভাবছে, এই আনন্দ অনন্তকাল স্থায়ী । এই আনন্দের সঙ্গে একটু একটু পাপবোধ মিশে আছে, তাই তা আরও তীব্র ।

ঝর্ণার বুক প্রিয়ব্রত তার ঠোঁট দিয়ে লালায় মাখামাখি করে ফিস ফিস করে বলল, আমি কখনো দেখিনি । আমি কখনো সবটা দেখিনি ।

—দরজা খোলা । দরজা বন্ধ করুন ।

ঝর্ণাকে ছেড়ে প্রিয়ব্রত দ্রুত দরজা বন্ধ করল । ছিটকিনি তোলার সময় তার হাত কাঁপতে লাগল ভীষণ ভাবে । কি ভেবে সে আবার

ছিটকিনিটা খুলে দিয়ে দরজাটা ভেজিয়ে রেখেই ফিরে এল । ঝর্ণার কোমর দু'হাত জড়িয়ে ধরে চেয়ারে বসে পড়ে বলল, আমি জানি তুমি কাকে ভালবাসো ।

—কাকে ?

—সুভদ্রকে ।

—বাসিই তো ।

—তাহলে আমরা এখন যা করছি এটা অন্যায় নয় ?

—নিশ্চয়ই অন্যায় ।

—তবে ?

ঝর্ণা এবার প্রিয়ব্রতর গালে এক চড় কষিয়ে বলল, ছাড়ুন ! আমার আঁচল ছাড়ুন ।

প্রিয়ব্রত গালে হাত বুলোতে বুলোতে বলল, আমাকে কেউ কখনো মারেনি । আমার খুব জোর লেগেছে ।

—আর আমি বুঝি রোজ গালে চড় খাই ?

—আমার আর একটা বড় পাওনা আছে । চট করে মেরে নাও ।

ঝর্ণা মুহূর্ত দ্বিধা না করে রীতিমতন জোরে চড় মারল । প্রিয়ব্রত চোখ মিটমিটিয়ে হাসতে হাসতে বলল, তুমি আমার বুকে একবার কামড়ে দিয়েছ । সেটা আমার ফেরত নেওয়া উচিত, না ?

ঝর্ণা আবার কাছে এগিয়ে এসে প্রিয়ব্রতর বুকে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, বেশি জোর লেগেছিল ? ইস, দাগ হয়ে গেছে ।

প্রিয়ব্রত ফের ঝর্ণার কোমর জড়িয়ে ধরেছে । আফসোসের সুরে বলল, সুভদ্র খুব ভাগ্যবান । অনেক মেয়েই ওকে ভালবাসে । আমাদের ক্লাশের রুচিরাও ওকে ভালবাসে ।

—জানি ।

—তোমার হিংসে হয় না ?

—একটুও না । রুচিরা ওর কতটুকু জানে ? আমি ওকে ছোটবেলা থেকে চিনি ।

—আমি আমার দিদি বৌদি ছাড়া আর কোন মেয়ের সঙ্গেই মিশিনি।

—সেটা আপনাকে দেখলেই বোঝা যায় ?

—আচ্ছা, আমি যে আজ তোমাকে আদর করলাম, এটা জানতে পারলে সুভদ্রর হিংসে হবে না ?

—আহা কি আদরেরই ছিরি! শুধু মারামারি।

প্রিয়ব্রত ঝর্ণাকে টেনে এনে নিজের শরীরের সঙ্গে মিশিয়ে দেবার চেষ্টা করতেই নিচে কলিংবেলের আওয়াজ শোনা গেল। ঝর্ণা তড়িৎবেগে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, দাদা এসে গেছে!

প্রিয়ব্রত তবু তক্ষুণি তাকে ছাড়ল না। উঠে দাঁড়িয়ে আর একবার ঝর্ণার ঠোঁটে ঠোঁট ডোবালো। তৃষ্ণার তো শেষ নেই।

॥ ৭ ॥

মাধুরীর এখন একটা বাইরের জগৎ আছে। এখন আর সে সারাদিন ঘরে আটকে থাকে না। সকালবেলা চা-জলখাবারের ব্যবস্থা এখনো সে নিজে করে, তারপর দশটার আগেই ভাত খেয়ে স্কুলে বেরিয়ে যায়। কোন কোন দিন সে প্রিয়ব্রতর সঙ্গে একসঙ্গেই বেরোয়—বেশির ভাগ দিন অবশ্য তাকে আগেই যেতে হয়। তাদের স্কুলে একটুও দেরি করে যাবার নিয়ম নেই।

টালিগঞ্জের একই ট্রাম-স্টপ থেকে সে রোজ ওঠে, নামে থিয়েটার রোডে। প্রত্যেকদিন দেখে দেখে এই সব জায়গার কিছু কিছু লোক তাকে চেনে। কাছাকাছি দোকানদার, রকের আড্ডাবাজ ছেলের দল চেনা চোখে তাকায় তার দিকে। ট্রামের কয়েকজন কণ্ডাকটরের মুখও পরিচিত হয়ে গেছে। এমন কি কিছু কিছু সহযাত্রী প্রত্যেকদিন একই সময়ে একই ট্রামে যায় বলে মুখ-চেনা হয়ে গেছে—অনেকেই তাকে দেখে নিজেদের মধ্যে নীচু গলায় কিছু আলোচনা করে।

এর মধ্যে কেউ কেউ মাধুরীকে দেখে একটু বেশী রসস্থ হয়ে পড়বে গা ঘেঁষে দাঁড়াবার চেষ্টা করবে, কথা বলতে চাইবে—এটাও তো খুব অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু মাধুরীর চেহারায় ও আচরণে এমন একটা কোমল অথচ কঠিন প্রতিরোধের চিহ্ন আছে যে কেউ তাকে অপমান করার সাহস পায় না। সে মুখখানা আড়ষ্ট করে কিংবা ভুরু কুঁচকে থাকে না কখনো। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে সে হাসিমুখেই উত্তর দেয়। কিন্তু সব সময় এমন একটা সম্ভ্রম ও সুরুচি ঘিরে থাকে যে কেউ তার উদ্দেশ্যে কোন অরুচিকর কথা বলতে পারবে না। পৃথিবীতে এখনো তো পবিত্রতার কিছুটা মূল্য আছে।

যে-স্কুলে মাধুরী পড়ায়—সেটি বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। নতুন বাড়ি, দেওয়ালে টাটকা রং, ঝকঝকে তকতকে চেয়ার-টেবিল। ছাত্রীরা প্রায় সবাই উচ্চ-মধ্যবিত্ত পরিবারের, ছুটির সময় স্কুলের বাইরে মোটরগাড়ির লাইন পড়ে যায়। সমস্ত ছাত্রীকেই অবশ্য একই রকম সাদা ও নীলে মেশানো স্কার্ট বা শাড়ি পরতে হয়।

হেডমিস্ট্রেস উমা বড়ুয়া বিলেত থেকে ডিগ্রী নিয়ে এসেছেন—খুব দক্ষতার সঙ্গে স্কুলটা চালান। দেখে মনে হয় না তিনি এখানে চাকরি করছেন, মনে হয় এটাই যেন তাঁর জীবনের ব্রত। ব্রতটা অবশ্য এমন কিছু মহৎ নয়, কিছু বড়-লোকের বাড়ির মেয়েদের ইঙ্গ-বঙ্গ শিক্ষায় রপ্ত করাচ্ছেন। উমা বড়ুয়া নিজে বাঙালীর মেয়ে, বিয়ে করেছিলেন একজন অসমীয়া ভদ্রলোককে, কিন্তু স্কুলে সারাক্ষণ তিনি ইংরেজি ছাড়া একটি অক্ষর উচ্চারণ করেন না। বেয়ারা বা দারোয়ানদের সঙ্গে কথা বলার জন্য দু'একটা হিন্দী শব্দ উচ্চারণ করতে হয়—তাও যেন নেহাত দয়া করে।

প্রথম প্রথম ক্লাসে এসে বেশ আড়ষ্ট বোধ করত মাধুরী, কুল কুল করে ঘাম বইত পিঠ দিয়ে। এখন এই চাকরি তার বেশ ভালই লাগে। এখন সে অনুভব করে, এই পৃথিবীব্যাপী বিপুল সংসারে

যে বৃহৎ কর্মযজ্ঞ চলছে, সে-ও তার একজন অংশীদার। তার জীবন-শুধু একটি বাড়ির পরিমণ্ডলে আবদ্ধ নয়!

অন্য কয়েকজন মেয়ে-টিচারের সঙ্গে তার আস্তে আস্তে সখ্যতা হয়—কখনো কখনো মাধুরী তাদের বাড়ি যায়, তারাও মাধুরীদের বাড়ীতে আসে, এটাই সামাজিক নিয়ম।

—বৌমা, তোমার আজ ফিরতে এত দেরি হল যে?

গগনেন্দ্র বাইরের ঘরে বসে ছিলেন, সন্ধ্যে পার করে মাধুরী বাড়ি ফিরল। আঁচল দিয়ে মুখ মুছে মাধুরী বলল, আজ আমাদের স্কুল তাড়াতাড়ি ছুটি হয়ে গেল তাই আমরা সব টিচাররা মিলে উমাদির বাড়ি গিয়েছিলাম।

—কোথায় ও'র বাড়ি?

—শিবপুরে। বোটানিক্যাল গার্ডেনসের একেবারে পাশেই। উমাদির হাসব্যান্ড তো শিবপুর বি ই কলেজে পড়ান। সেখানেই কোয়ার্টার।

—ও। আমি একটু চিন্তা করছিলাম। তোমার তো ফিরতে সাধারণত দেরি হয় না।

—হঠাৎ ঠিক হল। সবাই মিলে যাওয়া ঠিক হল, আমি একলা না গেলে ভাল দেখায় না।

—না, না, গিয়েছ বেশ করেছ যাবে না কেন? তবে, আমরা কোন খবর পাইনি তো—বুড়ো মানুষ, আমাদের এমনিই চিন্তা হয়।

—খবর দেবার কোন উপায় ছিল না।

—সেটা এখন বুঝতে পারছি। আমি বেরিয়ে গিয়ে মোড়ের ডাক্তারখানা থেকে তোমাদেরই স্কুলে একটা টেলিফোন করলাম। টেলিফোন বেজেই গেল, কেউ ধরল না। আমার ভয় হল, পথে কোন বিপদ-টিপদ হল নাকি—তুমি তো রাস্তাঘাট ভাল করে চেনো না।

—না বাবা, এখন আমি রাস্তাঘাট ভালই চিনে গেছি। বাড়িতে একটা টেলিফোন থাকলে অনেক সুবিধে হয়।

মাধুরী তাড়াতাড়ি মুখ-হাত ধুয়ে শাড়ি পাল্টে নিল। তারপর গেল শাশুড়ির ঘরে। মন্দাকিনী আজকাল একেবারেই বিছানা ছেড়ে ওঠেন না, বাড়িতে তাঁর উপস্থিতি টেরই পাওয়া যায় না। মাধুরী শাশুড়িকে ওষুধ খাওয়াল, বিছানার চাদর পাল্টে দিল, পাশে বসে গল্প করল কিছুক্ষণ।

একটু বাদে প্রিয়ব্রতর ঘরে উঁকি দিয়ে জিজ্ঞেস করল, কিরে, জলখাবার-টাবার খেয়েছিলি তো ঠিক মতন?

প্রিয়ব্রত বিছানার ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে ছিল কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে। একমনে কি যেন ভাবছে। আজকাল তাকে প্রায়ই একা একা এরকম ভাবতে দেখা যায়।

বৌদিকে দেখে পাশ ফিরে বলল, কি, কোথায় যাওয়া হয়েছিল, অ্যাডভেঞ্চার করতে? বাবা তো ভেবে ভেবেই সারা!

মাধুরী মুচকি হেসে বলল, বোটানিক্যাল গার্ডেনে গিয়েছিলাম।

—কার সঙ্গে?

—স্কুলের টিচারদের সঙ্গে!

—ধুস! আমরা ভাবলাম আমাদের ভালমানুষ বৌদিটি বুঝি হারিয়েই গেল।

—সাড়ে সাতটার মধ্যেই তো ফিরে এসেছি।

—আমি বাবাকে বোঝাবার চেষ্টা করছিলাম যে এত বেশী চিন্তা করার কিছু নেই। কলকাতায় মেয়েরা একা একাও নটা দশটা পর্যন্ত ঘুরে বেড়ায়।

—না রে, খবর না দিয়ে যাওয়া আমারই ভুল হয়েছে।

—কিছু ভুল হয়নি। তুমি যতক্ষণ ইচ্ছে বাইরে থাকবে।

স্কুলের টিচারদের মধ্যে করবী আর সান্ত্বনা এই দুজনের সঙ্গেই মাধুরীর বেশী ভাব। আপনি থেকে এখন তুমি, অন্যদের সঙ্গেও তার সম্পর্ক বেশ ভালই। সব জায়গার মতনই, এই স্কুলেও কিছু দলাদলি আছে টিচারদের মধ্যে। কারা হেডমিস্ট্রেসের বেশী অন্তরঙ্গ

আর কারা অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমিস্ট্রেসের দিকে টেনে কথা বলা, এটা দ্'চারদিনের মধ্যেই বোঝা যায়। মাধ্রী কোন দলের মধ্যেই নিজেকে মিশিয়ে দেয়নি, গা বাঁচিয়ে রেখেছে।

স্কুলে দ্'জন মাত্র প্র্ষ টিচার আছে। অবশ্য অনেক বাছাবাছি করে করে বেশ খারাপ চেহারার দ্'জন প্র্ষকেই রাখা হয়েছে। একজন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান তার গাল-ভর্তি বড় বড় ফোড়ার দাগ, তিনি পার্ট-টাইম শিক্ষক, এসে শ্ধ্ নিজের কাজটুকু সেরেই চলে যান, আর একজন বাঙালী, বয়েস চল্লিশের কাছাকাছি, চোখ একটু ট্যারা। ইনি অঙ্কের শিক্ষক। সারা স্কুলে এই লোকটির অবস্থাই সবচেয়ে শোচনীয়—এতগ্লি মেয়ের মধ্যে একমাত্র প্র্ষ—কিন্তু ভদ্রলোকের মেয়েদের সঙ্গে মেশার কোন ক্ষমতাই নেই, স্বভাবটাও পাগলা। যে-টুকু সময় ক্লাস থাকে না—স্কুলের পেছনের ছোট্ট বাগানটায় অনবরত পায়চারি করেন। অন্যান্য মেয়ে-টিচাররা কেউ কখনো কিছ্ নিজের থেকে জিজ্ঞেস করলে ইনি হ্যাঁ কিংবা না—তার বেশী আর কিছ্ বলেন না। অথচ অঙ্কে ইনি খ্বই ভাল। তব্ কেন যে এই স্কুলের চাকরিতে এসে ঠেকেছেন, কে জানে! এক একটা মান্ষ থাকে এরকম—যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও যাদের জীবনের উন্নতি হয় না, স্খ বা স্বাচ্ছন্দ্য কাকে বলে তা জানেই না।

মাধ্রীর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে অনেকেই কৌত্হলী। কেউ অবশ্য সরাসরি কিছ্ জিজ্ঞেস করে না, মাধ্রী তার ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ কখনো তোলে না। সে সাদা শাড়ি-ব্লাউজ ছাড়া আর কিছ্ পরে না—কোনরকম প্রসাধনের চিহ্ন থাকে না তার শরীরে। সিঁথিতে অবশ্য সামান্য রেখা আছে সিঁদ্রের—শাশ্ড়ি যতদিন বেঁচে আছেন, ততদিনে এটা রাখতেই হবে মাধ্রীকে।

মেয়েদের কৌত্হল তির্যক ভাবে বেরিয়ে আসে মাঝে মাঝে। কথার ঝোঁকে কেউ জিজ্ঞেস করে, মাধ্রীর ক'টা ছেলেপ্লে। কিংবা তার স্বামী কলকাতার বাইরে থাকে কিনা। মাধ্রী যথাসম্ভব উত্তর

এড়িয়ে যায়।

স্কুল ছ্টি হবার পর করবী একদিন প্রায় জোর করে মাধ্রীকে টেনে নিয়ে গেল তার বাড়িতে। স্কুল ছ্টির পর করবী আর সে দাঁড়িয়েছিল ট্রাম-স্টপে। কি কারণে কিছ্ক্ষণ ট্রাম-বাস আটকে ছিল এখন, তাই অসম্ভব ভিড়।

একটা একটু ফাঁকা ট্রাম দেখে মাধ্রী উঠতে যাচ্ছিল, করবী বলল, দাঁড়াও, এটা না, পরেরটায়।

মাধ্রী আর করবী কিছ্টা পথ একসঙ্গে যায়—করবী থাকে চেতলায়, হাজরার মোড়ে নেমে ট্রাম বদল করে।

মাধ্রী জিজ্ঞেস করল, কেন, এটায় নয় কেন?

—এটাতে ঐ অপয়া লোকটা উঠছে। ও আগে চলে যাক।

মাধ্রী তাকিয়ে দেখল, ওদের অঙ্কের শিক্ষক জীবনলাল উঠেছে সেই ট্রামে।

—কেন, ও অপয়া কেন?

—কি জানি ভাই, ট্যারা লোকদের দেখলেই আমার বিচ্ছিরি লাগে।

—আমার এক কাকা ছিলেন ট্যারা। তিনি কিন্তু খ্ব ভাল লোক ছিলেন।

—তা হতে পারে। কিন্তু এই জীবনলালটাকে দেখলেই আমার কি রকম যেন রাগ হয়। এক নম্বরের অপয়া। একদিন ওর সঙ্গে এক ট্রামে উঠেছিলাম—সেইদিনই নামতে গিয়ে আমার ঢাকাই শাড়িটা অ্যাতখানি ছিঁড়ে গেল!

মাধ্রীর একট্ দ্ঃখ হল জীবনলালের জন্য। লোকটার হয়তো এমনিতে কোন দোষই নেই, তব্ অন্যরা তাকে অপছন্দ করে। ওর চেহারা দেখতে স্ন্দর নয়, কিন্তু সে জন্য কি ও দায়ী?

পরের ট্রাম-বাসে ওঠা প্রায় অসম্ভব। একটা খালি ট্যাক্সি দেখে করবী ফস করে ডেকে বসল, মাধ্রীকে বলল, চল, তোমাকে বাড়িতে

নামিয়ে দিয়ে যাব।

—না, না, তুমি শুধু শুধু অতখানি ঘুরবে কেন?

—তাহলে চল, তুমি আমার বাড়িতে চল—একটু চা-টা খেয়ে তার পরে যেও।

—ও বাবা! সে হবে না। আজ থাক।

করবী ততক্ষণে ট্যাক্সির দরজা খুলে ফেলেছে। মাধুরীর হাত ধরে বলল, আগে ওঠ তো, তারপর কথা।

ভেতরে বসে বলল, কেন, যাবে না কেন?

—আমাকে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হবে।

—বিশেষ কোন কাজ আছে?

—না, ঠিক তা নয়—

করবী মাধুরীর কানের কাছে মুখ এনে বলল, আমার ভাই একলা ট্যাক্সিতে উঠতে ভয় করে। তুমি নেমে গেলে আমি একা যেতে পারব না।

—তা হলে তুমি আমাদের বাড়িতে এস।

—আমার ছেলে যে স্কুল থেকে ফিরে আমাকে না দেখলে চ্যাঁচা-মেচি করবে। তোমার তো ভাই বেশ সুবিধে, নির্ঝঞ্ঝাট, বাচ্চা-কাচ্চা নেই, কর্তাও কলকাতায় থাকেন না। বাচ্চা-কাচ্চা হলে বুঝতে কি ঝকমারী।

মাধুরী চুপ করে রইল। করবী আবার বলল, চল না, একটুক্ষণ বসে প্রাণ খুলে গল্প করব। ইস্কুলে কি গল্প করার উপায় আছে?

—আমার শ্বশুর বড্ড চিন্তা করেন।

—একদিন না হয় একটু চিন্তা করলেনই। কি আর হবে?

করবীর সংসারটা বেশ ছোট্ট, ছিমছাম। তিনখানা ঘরের ফ্ল্যাট, সঙ্গে বারান্দা। স্বামী, স্ত্রী ও একটি সাত বছরের ছেলে। স্বামী স্ত্রী দুজনেই চাকরি করে বলে একজন অত্যন্ত বিশ্বস্ত বুড়া দাসীই রাঁধুনি এবং তার হাতেই সংসারের প্রায় সব ভার।

করবীর স্বামীর নাম অরূপ, ছেলের নাম রঞ্জন। অরূপ এখনো ফেরেনি—তার একটি বাঁধানো ছবি রয়েছে করবীর ড্রেসিং টেবিলে। স্যুট পরা মোটামুটি সুদর্শন যুবক চাকরি করে মার্কেণ্টাইল ফার্মে। স্বামী স্ত্রী দুজনেই চাকুরে বলে এদের সংসারটি বেশ সচ্ছল।

রঞ্জন ছেলেটি বেশ দুরন্ত, ঘরময় লাফালাফি করে বেড়াচ্ছে। এক মাথা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, বড় বড় চোখ। মাধুরী তাকে একটু কাছে নিয়ে আদর করতে চায়, কিন্তু সে এক জায়গায় স্থির থাকতে পারে না—ছটফটিয়ে পালাল।

মাধুরীর ছেলেটি বেঁচে থাকলে ঠিক এই বয়েসীই হত।

ঠিক এই রকম একটা ছিমছাম সংসার এতদিনে মাধুরীরও হতে পারত।

মাধুরী হাসিমুখে করবীকে বলল, ভারী সুন্দর তোমার ফ্ল্যাটটা। বাবস্থা-ট্যাবস্থাগুলো এত সুন্দর। দক্ষিণ খোলা—

করবী চা ছাঁকতে ছাঁকতে বলল, আমারও এটা খুব পছন্দ। একটু দূরে, আমাদের দুজনেরই যাতায়াতের অনেক খরচ লাগে—তবু আমি এটা ছাড়তে চাই না! সান্ত্বনার বাড়িতে গেছ তুমি? বিচ্ছিরি! যা ঘিঞ্জি পাড়া।

করবীর একটু পরচর্চা করা স্বভাব। তবে তার চরিত্রটা খোলা-মেলা ধরনের, দুমদাম করে কথা বলে ফেলে—তার মধ্যে বিদ্বেষ নেই, কাঁটা নেই তাই তাকে খারাপ লাগে না। মাজা-মাজা গায়ের রং, চ্যাপ্টা ধরনের মুখ—শরীর একটু মোটার দিকে যাচ্ছে—সব মিলিয়ে বেশ একটা সুখী-সুখী ভাব। সব মিলিয়ে অন্য অনেকের তুলনায় করবী তার স্বামী-পুত্র নিয়ে এই ছোট্ট সংসারে অনেক বেশী সুখে আছে, এটা তার কথাবার্তায় ফুটে বেরোয়।

একটু বাদেই করবীর স্বামী অরূপ এসে হাজির হল। ছবিতে যে রকম দেখা গিয়েছিল, তার সঙ্গে তার চেহারার ঠিক মিল নেই। ছবিটা কোন সুকৌশলী ফটোগ্রাফারের তোলা, অরূপ অত সুদর্শন

নয়। সে বেশ রোগা, লম্বা বলে আরও রোগা দেখায়—নাকটা খাড়া হয়ে আছে, চোখের নীচে কালো দাগ।

করবী তার স্বামীকে দেখে একমুখ হেসে বলল, তুমি আজকে এত তাড়াতাড়ি ফিরলে যে? ভালই হয়েছে—

অরূপ বলল, দুপুরে একটা পার্টির সঙ্গে বেরিয়েছিলাম, আর অফিসে যাই নি। আর একবার বেরুতে হবে একটু বাদে।

—আবার কোথায় বেরুবে?

—যাদবপুরে দাশগুপ্তদা'র বাড়িতে একবার যেতেই হবে। জরুরী কাজ আছে।

মাধুরী এবার উঠতে চাইল। করবীর স্বামী এসেছে, এখন তার ব্যস্ত হবার কথা। কিন্তু সে কথা বলার সুযোগই পাচ্ছে না।

করবী তার স্বামীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল মাধুরীর। অরূপ হাতজোড় করে নমস্কার জানিয়ে বলল, আপনার কথা অনেক শুনেছি। করবী তো প্রায়ই আপনার কথা বলে।

মাধুরী লজ্জা পেয়ে বলল, আমার সম্পর্কে এত বলার কি আছে?

—বাঃ, আপনিই তো মিষ্টি লেডি? তাই না? আপনার সম্পর্কে কেউ কিছু জানে না।

করবী ভুরু দিয়ে ধমকালো তার স্বামীকে। কিন্তু অরূপকে মনে হল সরল ধরনের মানুষ, সে রেখে-ঢেকে কথা বলার ধার ধারে না। হাসতে হাসতে বলল, আপনি ওদের স্কুলের টিচারদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরী, আপনার কপালে সিঁদুর আছে—অথচ আপনার স্বামী সম্পর্কে কেউ কিছু শোনে নি। জানেন তো, মেয়েদের কি রকম কিউরিয়োসিটি—সবটা না জেনে কিছুতেই ওদের শান্তি নেই। আসল রহস্যটা কি বলে ফেলুন তো!

মাধুরী শান্ত ভাবে বলল, আমার কোনই রহস্য নেই।

তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, করবী, ভাই, এবার আমাকে যেতে হবে।

অরূপ বলল, আরে বসুন, বসুন! আমি তো বেরোচ্ছিই একটু বাদে, আপনাকে নামিয়ে দেব এখন। আপনি কোন দিকে থাকেন?

করবী উৎসাহের সঙ্গে বলল, হ্যাঁ, ও, তো যাদবপুরেই যাবে—তোমাকে টালিগঞ্জে নামিয়ে দিয়ে যাবে। বস তো চুপটি করে।

অরূপ কিছুক্ষণ গল্প করে স্নান করতে গেল। স্নান করে জামা কাপড় পরে টরে ও আবার মেতে গেল গল্পে। বেরুবার নামটি নেই। অরূপ কথা বলে ঝড়ের বেগে, ঠিক অভিনেতার মতন সে কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে হাত-মুখ নাড়ে। হাসির কথা বলে সে নিজেই হেসে ওঠে সবচেয়ে আগে। কোন কিছু গভীর ভাবে ভাববার সময় হয় না তার। তার চোখে একটা লালচে ভাব।

মাধুরী বুঝতে পারল, তার যথেষ্ট দেরী হয়ে যাচ্ছে। মনের মধ্যে একটা উদ্বেগ। তবু শান্ত গাম্ভীর্য নিয়ে বসে রইল—ছটফটানি দেখানো তার স্বভাব নয়।

খানিকটা বাদে করবীই তার স্বামীকে বলল, কই, তুমি যাবে বললে যে? মাধুরীকে ফিরতে হবে।

মাধুরী উঠে দাঁড়িয়ে বলল, উনি পরে বেরোবেন না হয়। আমি একাই যেতে পারব।

অরূপ তখন লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আরে না, না, আমি এক্ষুনি যাচ্ছি। আপনাকে লিফ্‌ট দেবার একটা চান্স পেয়েছি যখন—তখন কি আর সেই সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হই!

করবী তার স্বামীর চোখে চোখ রেখে বলল, তাড়াতাড়ি ফিরবে তো?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। বেশীক্ষণ লাগবে না।

শুনলেই বোঝা যায়, অরূপ প্রায়ই খুব দেরী করে বাড়ি ফেরে। হয়তো তার কাজের ধরনই সেই রকম।

ট্যাক্সিতে উঠে অরূপ ঘড়ি দেখে বলল, আপনি আটটার মধ্যেই পৌঁছে যাবেন। কিংবা আপনার খুব বেশী তাড়া আছে—না হলে

রাস্তায় এক কাপ কফি খেয়ে যেতাম। হাজরার কাছেই একটা ম্যাড্রাসী দোকানে দারুণ কফি বানায়।

মাধুরী বলল, আমি তো আর একটুও দেরী করতে পারছি না। আমি বরং চলে যাই এই ট্যাক্সি নিয়ে—

—তার দরকার নেই। চলুন আমিও যাচ্ছি। দাশগুপ্তদা'র সঙ্গে আমার অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট ন'টার সময়। হাতে কিছুটা সময় আছে। এক কাজ করুন না, আপনার বাড়িতেই এককাপ কফি খাওয়ান না! আপত্তি আছে?

মাধুরী তক্ষুণি এ কথার কোন উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইল। মাত্র কিছুক্ষণ আগে অরূপের সঙ্গে তার পরিচয়, এরই মধ্যে অরূপ নিজে থেকে প্রস্তাব দিয়ে ফেলল তার বাড়ি যাওয়ার। এরকম হয় নাকি? করবী যদি সঙ্গে থাকত, সেটা আলাদা কথা।

মাধুরীকে চুপ করে থাকতে দেখে অরূপ জিজ্ঞেস করল, কি, অসুবিধে আছে বুঝি?

মাধুরী মুখ নিচু করে বলল, একটু।

—ঠিক আছে, তা হলে আর একদিন হবে।

অরূপ কথা বলার জন্য যখনই মাধুরীর দিকে মুখ ফেরায়, মাধুরী একটা গন্ধ পাচ্ছে। করবীর ফ্ল্যাটে থাকতেও এই গন্ধটা পেয়েছিল, এখন স্পষ্ট বুঝতে পারল। অরূপের মুখে মদের গন্ধ। এই জন্যই অরূপ এত হালকা ভাবে কথা বলছে।

অরূপ নিজেই আরও অনেক কথা বলে গেল, মাধুরীর কাছ থেকে উত্তর পাক বা না পাক। সে সিনেমা থিয়েটার বেশ ভালবাসে। একটি হিন্দী ফিল্ম বাজার গরম করে রেখেছে—মাধুরী তখনও সেটা দেখেনি শুনে অরূপ বিষম আশ্চর্য হয়ে সবিস্তারে সেই ফিল্মটার গল্প শোনাতে লাগল।

অরূপ সিটের ওপর হাত ছড়িয়ে বেশ ঢিলেঢালা ভাবে বসেছিল, কথা বলতে বলতে তার হাত আলতো ভাবে মাধুরীর কাঁধ স্পর্শ

করে। যেন তার খেয়ালই নেই। মাধুরীর শরীরটা আড়ষ্ট হয়ে যায়। এরকম অভিজ্ঞতা তার আগে কখনো হয় নি। সে জানে, নারী ও পুরুষের মধ্যে একটা সম্মানজনক দূরত্ব রাখাই স্বাভাবিক। হয়তো অরূপ সত্যিই অন্যমনস্ক—তাহলে কোন দোষ দেওয়া যায় না। খুব সাবধানে মাধুরী একটুখানি সরে যাবার চেষ্টা করল। এবং কথা বলার ঝোঁকেই অরূপের হাতটা আরও এগিয়ে এসে চেপে ধরল মাধুরীর কাঁধ।

একটা বিষণ্ণ নিশ্বাস ফেলে মাধুরী ট্যাক্সির জানালা দিয়ে তাকাল বাইরে! আর বেশী দূরে নেই, তার বাড়ি এসে গেছে। অরূপের হাত পড়ে আছে তার কাঁধের ওপরে—এর জন্য মাধুরীর যত না লজ্জা বা গ্লানি—তার চেয়েও বেশী রকমের ভয় মেশানো অস্বস্তি—যদি রাস্তা থেকে চেনাশুনো কেউ দেখে ফেলে?

নিজের চেয়েও বেশী দুঃখ হল করবীর জন্য। একটু আগে করবীর ছিমছাম ছোট্ট সংসার দেখে সে ভেবেছিল, করবী তার জীবন নিয়ে সত্যিই সুখী। করবীর মুখেও সেই চিহ্ন ছিল। হায় সুখ! সুখের চেহারা এত দ্রুত বদলে যায়! এই ধরনের লঘুমতি স্বামীকে নিয়ে করবী তার সারা জীবনে কি ধরনের সুখ পাবে কে জানে?

টালিগঞ্জে মাধুরীদের বাড়ির সামনে এসে ট্যাক্সি থামল। মাধুরী নেমে যাওয়ার পর অরূপ জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলল, ঠিক আছে, তাহলে কফি পাওনা রইল? আর একদিন এসে খেয়ে যাব।

মাধুরী এইটুকু অন্তত বোঝে যে খবর না দিয়ে দেরী করে বাড়ি ফেরার সময় কোন অনাত্মীয় পুরুষ যদি ট্যাক্সি করে পৌঁছে দিয়ে যায়—সেটা অন্যদের চোখে খারাপ দেখায়।

গগনেন্দ্র বাইরের ঘরেই বসে ছিলেন, কিন্তু একটি কথাও জিজ্ঞেস করলেন না।

মাধুরীর হঠাৎ ইচ্ছে হল, এই সব কিছুর বিরুদ্ধেই প্রতিবাদে ফেটে পড়তে। ভাল লাগে না, কিচ্ছু ভাল লাগে না।

॥ ৮ ॥

প্রিয়ব্রত সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে ডাকতে লাগল, বৌদি, বৌদি। কোন সাড়া পেল না। মাধুরীর ঘর অন্ধকার, দরজা খোলা। সারা বাড়ি নিস্তব্ধ।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে প্রিয়ব্রত আর একবার বৌদিকে ডাকল। বিছানা থেকে ক্ষীণ কণ্ঠে আওয়াজ এল, কি?

সুইচ টিপে আলো জেলে প্রিয়ব্রত জিজ্ঞেস করল, একি, এই সন্ধেবেলাই শুয়ে আছ কেন?

মাধুরী উঠে বসল। হঠাৎ আলো চোখে লাগায় চোখ কুঁচকে বলল, এমনিই।

—স্কুলে যাও নি?

—হ্যাঁ, গিয়েছিলাম।

—বৌদি, দশটা টাকা দাও তো।

মাধুরী বালিশের তলা থেকে চাবি বার করে দিয়ে বলল, আলমারি খুলে নিয়ে নে।

প্রিয়ব্রত আলমারি খুলতে খুলতে জিজ্ঞেস করল, বাবা কোথায়?

—বিকেলবেলা বেরিয়েছেন। ফেরেন নি এখনো।

—মা কেমন আছে আজ?

—বিকেলে ব্যথাটা বেড়েছিল, ঘুমের ওষুধ দিয়েছি।

—আমার আজ ফিরতে একটু দেরী হবে।

—এখন আবার বেরুবি?

—আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে আজ রাত্তিরে আমজাদিয়ায় মোগলাই খানা খাব ঠিক করেছি।

—তাহলে ঐ দশটাকাতে কি হবে?

—সবাই চাঁদা করে—

—ঠিক আছে, খুব বেশী দেরী করিস না, বাবা তাহলে চিন্তা করবেন।

প্রিয়ব্রত বেরিয়ে যাচ্ছিল, মাধুরী তাকে ডেকে বলল, এই প্রিয়, আলোটা নিবিয়ে দিয়ে যা তো!

প্রিয়ব্রত এই প্রথম বৌদির দিকে ভাল করে তাকাল। ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, তুমি এখন আবার ঘুমোবে? তোমার কি হয়েছে?

—কিছু হয় নি। তুই আলোটা নিভিয়ে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে যা।

প্রিয়ব্রত আলো না নিভিয়ে বিছানার কাছে এগিয়ে এল।

—তোমার মুখ-চোখ এরকম দেখাচ্ছে কেন? কি হয়েছে সত্যি করে বল তো?

—বলছি তো কিছু হয় নি।

প্রিয়ব্রত মাধুরীর কপাল ছুঁয়ে চমকে উঠল।

—এ কি, জ্বরে যে গা পুড়ে যাচ্ছে। এতক্ষণ বল নি কেন?

—সামান্য একটু সর্দি-জ্বর।

—সামান্য কি বলছ? থার্মোমিটার দিয়েছ? চার-পাঁচ হবে। প্রিয়ব্রত রেগে গিয়ে বলল, বৌদি, তুমি কি বল তো? জ্বর হয়েছে সেটা মুখ ফুটে বলতে পার না? ডাক্তার-টাক্তার দেখানো দরকার—

মাধুরী তাকে এক ধমক দিয়ে বলল, তোকে আর বেশী বাড়াবাড়ি করতে হবে না। তুই যা তো—

প্রিয়ব্রত চুপ করে গেল। হঠাৎ সে বুঝতে পারল একটা ব্যাপার। বহুকালের মধ্যে সে বৌদির কোন অসুখ-বিসুখ দেখেনি। ছোটখাটো কিছু হয়ে থাকলেও মাধুরী কারুকে টের পেতে দেয়নি। তা ছাড়া আর করবেই বা কি। মাধুরী মুখ ফুটে কাকে বলবে নিজের অসুখের কথা? বাবাকে বলা যায় না, মা নিজেই বহুদিন অসুস্থ। আর প্রিয়ব্রত আজকাল এত বেশী সময় বাইরে বাইরে কাটায় যে বৌদির সঙ্গে বিশেষ দেখাই হয় না। প্রিয়ব্রত একটু অনুতপ্ত বোধ করল।

একবার সে ভাবল যে আজ আর সে বন্ধুদের কাছে যাবে না। পরক্ষণেই মনে হল, তা কি করে হয়? বন্ধুদের সে কথা দিয়ে এসেছে, তারা কি ভাববে!

একটা বয়েস্ থাকে, যে সময় বাবা-মা, দিদি-বৌদির চেয়েও বন্ধুদের আকর্ষণ হয় অনেক বেশী। বন্ধুরা আমাকে ঘরকুনো মনে করবে কিংবা 'ভাল ছেলে' ভাববে-এই আশঙ্কা আর সব কিছুই ঢেকে দেয়।

সুতরাং আমজাদিয়ায় গিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতেই হবে—তার আগে বৌদির জন্যও কিছু করা দরকার। ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞেস করল, ডাক্তার ডেকে নিয়ে আসব?

—কিছু করতে হবে না তোকে। তুই যা, ঘুরে আয়। বেশী রাত করিস না।

—হঠাৎ এরকম জ্বর হল কি করে? মাথায় ব্যথা ট্যাথা আছে?

—তুই মিছিমিছি ব্যস্ত হচ্ছিস। আলোটা নিভিয়ে দে।

প্রিয়ব্রত আড়চোখে ঘড়ি দেখল। আর বেশী সময় নেই। বলল, ঠিক আছে তুমি ঘুমিয়ে থাক। আমি তাড়াতাড়ি ফিরে আসব।

আলো নিভিয়ে দরজা ভেজিয়ে প্রিয়ব্রত দ্রুত ওপরে উঠে গেল নিজের ঘরে। জামা-কাপড় ছেড়ে বাথরুমে গিয়ে তাড়াতাড়ি গায়ে খানিকটা জল ঢেলে নিলে। টাটকা পোশাক পরে সিঁড়ি দিয়ে গট গট করে নামতে নামতে সে বৌদির উদ্দেশ্যে আবার চেঁচিয়ে বলল, বৌদি, তুমি খেয়ে নিও। আমি দশটার মধ্যেই···

বড় রাস্তায় এসে প্রিয়ব্রত ট্রাম ধরবার জন্য দাঁড়িয়েছে। কিছুক্ষণ আগে বৃষ্টি হওয়ার জন্য রাস্তাঘাট ফাঁকা ফাঁকা। একটা পানের দোকানের রেডিওতে সানাই বাজাচ্ছেন বিসমিল্লা খান। দূরে ট্রাম আসছে ঠং ঠং করে। প্রিয়ব্রত আবার ঘড়ি দেখল, তার খুব বেশী দেরি হয় নি।

হঠাৎ প্রিয়ব্রতর শরীরে যেন একটা বিদ্যুৎ খেলে গেল। একটা

উপলব্ধি। এ কি করছে সে? নির্জন বাড়িতে তার বৌদি অতখানি জ্বর নিয়ে শুয়ে আছে, আর সে যাচ্ছে বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে হৈ-হুল্লা করতে। শুধু বন্ধু-বান্ধবদের আকর্ষণই নয়—সে বৌদিকে একটু মিথ্যে কথা বলেছে—তারা আজ চাঁদা করে খাবে না—আজ খাওয়াচ্ছে সুভদ্র, রুচিরাও আসবে—ঋণা অত অহংকার করে সুভদ্রর কথা বলেছিলে—কিন্তু রুচিরাই তো ক্রীতদাস করে ফেলেছে সুভদ্রকে এই কৌতূহলজনক ব্যাপারটাই বেশী করে টেনেছিল তাকে। সেই টানে সে বৌদির অসুখও উপেক্ষা করেছিল। তাদের দুঃখের দিনের মধ্যে কি একটা গোপন অঙ্গীকার ছিল না যে কেউ কারুর কাছ থেকে দূরে সরে যাবে না?

ট্রাম এসে পড়েছে, প্রিয়ব্রত লম্বা লম্বা পা ফেলে পার হয়ে গেল ট্রামলাইন, প্রায় ছুটে ফিরে গেল বাড়ির দিকে।

মাধুরীর ঘরের দরজা ঠেলে খুলে আলো জ্বালাতেই মাধুরী চোখ মেলে দেখল তাকে। তারপর ধড়মড় করে উঠে বসে আকুল গলায় বলল, কে? কে?

—আমি।

মাধুরী তবু বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইল প্রিয়ব্রতর দিকে। চোখেমুখে অদ্ভুত উত্তেজনা—যেন চিনতে পারছে না ওকে। আবার চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল, কে? কে?

—বৌদি, আমি—কি হয়েছে তোমার?

কাছে এসে প্রিয়ব্রত মাধুরীর গায়ে হাত দিয়ে দেখল তার শরীরে প্রচণ্ড জ্বরের হল্কা, চোখের দৃষ্টি ঘোর-লাগা। প্রিয়ব্রত তাকে ধরে ধরে শুইয়ে দিয়ে বলল, ইস, এত জ্বর! দাঁড়াও আমি জলপট্টি লাগিয়ে দিচ্ছি।

কাপে করে খানিকটা জল নিয়ে এল প্রিয়ব্রত, এদিক ওদিক খোঁজাখুঁজি করে এক টুকরো কাপড় যোগাড় করল। মাধুরী পাশ ফিরে শুয়ে আছে, প্রিয়ব্রত বিছানায় বসে পড়ে আস্তে আস্তে মাধুরীর

মুখটা ফিরিয়ে কপালে লাগিয়ে দিল জলপট্টি।

—যেতে ইচ্ছে করল না।

—ঘুরে এলেই পারতিস। আমার বিশেষ কিছু হয় নি।

—চুপ করে শুয়ে থাকে। বাবা ফিরে এলে বাবাকে বসিয়ে রেখে আমি ডাক্তার ডেকে আনব।

—আজই ডাক্তার ডাকতে হবে না। মনে হচ্ছে ইনফ্লুয়েঞ্জা।

—মাথায় ব্যথা করছে ?

—সারা শরীরে ব্যথা।

প্রিয়ব্রত মাধুরীর চুলের মধ্যে আঙুল ডুবিয়ে মাথা টিপে দিতে লাগল। একরাশ চুল তার, সমস্ত বালিশে ছড়ানো। চোখ বুজে রয়েছে মাধুরী, মাঝে মাঝে তার সারা শরীরটা কেঁপে উঠছে।

—শীত করছে তোমার ?

—হুঁ।

প্রিয়ব্রত উঠে গিয়ে পাখা বন্ধ করে দিয়ে এল, একটা চাদর ছড়িয়ে দিল মাধুরীর গায়ে।

—মাথাটা জল দিয়ে ধুইয়ে দেব ?

—না, তোকে ওসব কিছু করতে হবে না। তুই চুপ করে শুধু বসে থাক আমার কাছে।

জলপট্টিটা একটু বাদে বাদেই শুকিয়ে যাচ্ছে, প্রিয়ব্রত ভিজিয়ে দিচ্ছে আবার। মাথা থেকে ঘাড় পর্যন্ত টিপে দিচ্ছে আঙুল দিয়ে, তাতে যে মাধুরীর একটু আরাম হচ্ছে তা বোঝা যায়। হঠাৎ প্রিয়ব্রতর মনে পড়ল, গায়ের ব্যথা কমাবার তো নানারকম ট্যাবলেট থাকে—বাড়িতেও দু-একটা থাকবার কথা।

মুখ নিচু করে জিজ্ঞেস করল, ওষুধ খেয়েছ কিছু ?

—খেয়েছি। সুশীলার মা-কে বলিস, তোর খাবার দিয়ে দেবে। মীটসেফের মধ্যে তোর জন্য সন্দেশ রাখা আছে।

—আচ্ছা সে ঠিক আছে, তোমাকে ভাবতে হবে না। তুমি

রাত্তিরে কি খাবে ?

—কিচ্ছু না।

কোন একটা ব্যথায় মাধুরীর চোখ ও কপাল কুঁচকে গেল। উপুড় হয়ে শুয়ে বলল, আমার পিঠে আর কোমরের কাছে কিল মার তো! ভীষণ ব্যথা! চাদরটা সরিয়ে দে, এখন আবার গরম লাগছে।

মাধুরীর গায়ে হালকা হলুদ রঙের ব্লাউজ তার গায়ের রঙের সঙ্গে প্রায় মিশে আছে। প্রিয়ব্রত দুহাত দিয়ে আস্তে আস্তে কিল মারতে লাগল। মাধুরী বললে, আর একটু নিচু, আরও জোরে। আঃ—

—এবার ঠিক আছে ?

—না, আরও জোরে।

এর থেকে বেশি জোরে কোন মেয়েকে কিল মারা যায় না—তাই প্রিয়ব্রত দু'হাতে মাধুরীর কোমর ধরে থামচে থামচে টিপে দিতে লাগল। একটু বাদেই মাধুরী বলল, তোর হাত ব্যথা হয়ে যাচ্ছে থাক আর দরকার নেই।

—কিচ্ছু ব্যথা হচ্ছে না। তোমার ভাল লাগছে ?

মাধুরী ঠোঁট দিয়ে চেপে রইল। তারপর এক সময় হাত দিয়ে প্রিয়ব্রতর হাত সরিয়ে দিয়ে বলল, আর দরকার নেই।

বিছানায় উঠে বসে মাধুরী বলল, তুই এবার যা—কতক্ষণ বসে থাকবি। আমি এখন ঘুমিয়ে পড়ব।

—দাঁড়াও। থার্মোমিটারটা কোথায় আছে ? মা-র ঘরে ? এখনও জ্বরটাই দেখা হয়নি।

প্রিয়ব্রত তার মায়ের ঘরে গিয়ে দেখল, মা গভীর ঘুমে ঘুমন্ত। যখনই তাঁর বুকের ব্যথাটা বাড়ে, তাকে কড়া ঘুমের ওষুধ দিতে হয়। সারা বাড়িতে কোথায় কি ঘটছে, মা আজকাল তার খোঁজও রাখেন না।

থার্মোমিটারটা নিয়ে এসে প্রিয়ব্রত মাধুরীকে বলল, হাঁ করো।

মাধুরীর মুখের মধ্যে থার্মোমিটারটা দিয়ে প্রিয়ব্রত পাকা ডাক্তারের মতন মাধুরীর একটা হাত তুলে নিয়ে নাড়ির স্পন্দন দেখতে লাগল।

মাধুরীর চোখ দুটি জ্বলছলে।

এতটা প্রিয়ব্রতও আশঙ্কা করেনি। মাধুরীর জ্বর একশো পাঁচেরও বেশি। হঠাৎ এতখানি টেম্পারেচার উঠলে চিন্তারই কথা! অথচ মাধুরী সেরকম কাতরতা দেখায় নি কিছুই। মাধুরী প্রিয়ব্রতর হাত থেকে থার্মোমিটারটা নিয়ে পড়বার চেষ্টা করল। তারপর ওরই মধ্যে একটু হেসে বলল, আজকাল অনেকেরই এমন জ্বর হয়—আবার চট করে কমে যায়। তোকে ভাবতে হবে না—তুই পড়াশুনো করতে যা—আমি বুঝতে পারছি, আমার জ্বর এবার কমবে। ঘাম হচ্ছে।

প্রিয়ব্রত লক্ষ্য করল, কথা বলার সময় মাধুরী একটু একটু হাঁপাচ্ছে! তারপর সে বিছানা থেকে নামার চেষ্টা করতেই প্রিয়ব্রত ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাচ্ছ আবার?

—বাথরুমে যাব।

—তুমি ঘরে এস, আমি বসে আছি।

প্রিয়ব্রতর হয়তো উচিত ছিল মাধুরীকে ধরে নিয়ে যাওয়া। অতখানি জ্বরের মধ্যে মাধুরীর মাথা টলটল করছে। কিন্তু প্রিয়ব্রত ছেলেমানুষ, সে-ই বা অত বুঝবে কি করে? মাধুরী স্বাভাবিক ভাবে হেঁটে যাবার চেষ্টা করে দরজার কাছে অনাবশ্যক একটা ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেল মাটিতে। দুম করে একটা শব্দ হল তার মাথা ঠুকে যাওয়ার।

দারুণ ত্রাসের সঙ্গে ছুটে গেল প্রিয়ব্রত। সবল দুহাতে কোলে তুলে নিল মাধুরীকে। ঘোলাটে চোখ মেলে তীব্রকণ্ঠে মাধুরী বলল, কে? কে?

প্রিয়ব্রত এবার কোন উত্তর দিল না। মাধুরীকে আবার শুইয়ে দিল বিছানায়। হঠাৎ খুব অসহায় বোধ করল সে। পুরুষ হয়ে কতটা সেবা করতে পারে সে? মাধুরীর এখন বাথরুমে যাওয়া দরকার—কিন্তু সে কি ভাবে সাহায্য করবে? সুশীলার মা এত বুড়ি—তাকে দিয়ে কি কোন সাহায্য হবে? একজন নার্স কি এক্ষুণি

ডাকা দরকার? কি করে নার্সদের ডাকতে হয়? বাবা এখনো ফিরছেন না—বাবা হয়তো কোন সাহায্য করতে পারতেন।

মাধুরী বিকারের ঘোরে বলল, আমি চাই না। আমি তোমাকে আর দেখতে চাই না।

প্রিয়ব্রত ভিজে কাপড়ের টুকরোটা দিয়ে মাধুরীর চোখ দুটো মুছিয়ে দিতে দিতে ফিসফিসিয়ে ডাকল, বৌদি, বৌদি!

—আমি তোমাকে আর দেখতে চাই না। আমি ভাল আছি।

—বৌদি, আমি! আমি প্রিয়।

মাধুরীর চোখ আবার স্বাভাবিক হয়ে গেল। প্রিয়ব্রতর হাতখানা চেপে ধরল শক্ত করে। চোখের কোণ দিয়ে গড়িয়ে এল জল। ক্লান্ত গলায় বলল, প্রিয়, তোকে আমি চিনতে পারছিলাম না। তোর চেহারা হঠাৎ খুব বদলে গেছে।

—কই, বদলায় নি তো।

—আয়নায় দ্যাখ! ভীষণ, ভীষণ বদলে গেছে।

প্রিয়ব্রতর হাতখানা মাধুরী নিজের গালে চেপে ধরল। বলল, কি ঠাণ্ডা তোর হাতখানা।

—তোমার কোন ভয় নেই।

—আমি তো ভয় পাইনি রে!

—তুমি বাথরুমে যাবে না?

—হ্যাঁ, এবার ঠিক যেতে পারব।

—ওঠো। আমার সঙ্গে চল।

—এবার আমি ঠিক পারব!

—ওঠো বলছি! না হলে কোলে করে নিয়ে যাব!

প্রিয়ব্রত মাধুরীকে আস্তে আস্তে ধরে দাঁড় করাল। তারপর তার কাঁধ শক্ত করে ধরে হাঁটিয়ে নিয়ে গেল বারান্দার একপ্রান্তে বাথরুমের দরজা পর্যন্ত। বাথরুমের ভেতর তাকে দাঁড় করিয়ে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে বেরিয়ে আসতে আসতে বলল, ছিটকানি বন্ধ কোর না। কোন

দরকার নেই।

দ্রুত একতলায় নেমে গিয়ে রান্নাঘরে সুশীলার মাকে এক ধমক দিয়ে বলল, বৌদির এত জ্বর হয়েছে, একটু খবরও রাখো না! বৌদি বাথরুমে গেছেন, এক্ষুণি বাইরে গিয়ে দাঁড়াও। ধরে ধরে নিয়ে যাবে। এক্ষুণি আসছি।

প্রিয়ব্রত বেরিয়ে গেল মোড়ের মাথার ডাক্তারখানার দিকে। মাঝ-পথেই দেখা হয়ে গেল গগনেন্দ্রের সঙ্গে।

॥ ৯ ॥

ইনফ্লুয়েঞ্জা নয়, কিছুদিনই টাইফয়েডে ভুগলো মাধুরী। খুব বেশী মারাত্মক হয়নি। পাড়ার ডাক্তার প্রথমে একটু ভুল করেছিল, রক্তপরীক্ষায় দেরী হয়ে যায়—তাই মাধুরীকে বেশ কয়েকদিন শয্যাশায়ী থাকতে হয়। দ্বিতীয় দিন থেকেই একজন নার্স রাখা হয়েছিল—পাঁচদিন বাদে মাধুরী নিজেই তাকে আসতে নিষেধ করে দেয়। দুর্বলতা একটু কাটিয়ে ওঠার পরই মাধুরী স্বাবলম্বী হয়ে ওঠে। সে কখনো বিশেষ অসুখ-বিসুখে ভোগে না—তার জীবনী-শক্তি প্রবল, সেই জোরেই সে নিজেকে দ্রুত সামলে নেয়।

মাধুরী আর প্রিয়ব্রত দু'জনেরই দুটো বাইরের জগৎ হয়েছিল। এই উপলক্ষে তারা আবার কাছাকাছি চলে আসে। প্রিয়ব্রত কলেজ ছুটির পর আর কোথাও যায় না, সোজা বাড়ি ফেরে। মাধুরী যতক্ষণ জেগে থাকে, তার সঙ্গে গল্প করে। পুরুষমানুষ হয়ে সে রোগিনীর সেবা করতে না পারলেও সঙ্গ দিতে পারে। এ বাড়িতে সে রকমও যে আর কেউ নেই।

মাধুরীর মন ভালো রাখবার জন্য সে অনেক মজার মজার গল্প বলে, হাসায়। কখনো কখনো মাধুরী চুপ করে শুয়ে থাকে, তার শিয়রের পাশে বসে, প্রিয়ব্রত বই পড়ে। জ্বর বেশী থাকলে মাধুরীর কপালে ও মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়।

মাধুরীর পিঠে হাত দিয়ে বসিয়ে রেখে প্রিয়ব্রত তাকে ফলের রস খাওয়াল। তারপর তাকে ফের শুইয়ে তোয়ালে দিয়ে ঠোঁট মুছিয়ে বলল, এই তো, লক্ষ্মী মেয়ে, এবার সেরে উঠবে।

মাধুরী হাসল। তারপর বলল, তুই তোর সব খেলাধুলো, বন্ধুবান্ধবদের ছেড়ে রুগীর পাশে দিনরাত বসে থাকিস কেন? বাইরে যা না!

—বাঃ, বাইরে বৃষ্টি পড়ছে, এর মধ্যে ঘুরে বেড়াব নাকি?

—সব সময় তো বৃষ্টি পড়ে না। তোর বন্ধুরা তোর জন্য ছটফট করছে না?

—তুমি তাড়াতাড়ি সেরে ওঠো, তারপর বাবাকে বলে আমরা সবাই মিলে কোথাও বেড়াতে যাব।

—তুই এত সেবা করছিস তো—সেই জন্যই আমি সেরে উঠছি, তোর হাতের সেবা পেতে খুব ভাল লাগছে।

—চলো বৌদি আমরা আর একবার হায়দ্রাবাদ থেকে ঘুরে আসি। তোমার যেতে ইচ্ছে করে না?

মাধুরী উৎসাহিত হয়ে বলল, খুব ইচ্ছে করে। খুব ভাল লাগবে। কিন্তু মা? মা কি করে যাবেন? মা কেমন আছেন রে আজ?

—একই রকম।

—মা একটু ভাল হয়ে উঠুক। তারপর সবাই মিলে একসঙ্গে বেশ যাওয়া যাবে।

দু'জনেই একটু চুপ করে গেল। হায়দ্রাবাদ বেড়াতে যাবার প্রসঙ্গটা আর তেমন জোরালো রইল না। মন্দাকিনীর সেরে ওঠার সম্ভাবনা খুবই কম!

প্রিয়ব্রত বসেছিল মাধুরীর শিয়রের কাছে। বেশীক্ষণ সে খাড়া হয়ে বসতে পারে না। শরীরটাকে এলিয়ে দিয়ে বলল, বৌদি, একটু সরো তো। পা দুটো একটু ছড়াই।

—এত ঘেঁষাঘেঁষি করিস না। এই অসুখটা ছোঁয়াচে না?

—ভীষণ ছোঁয়াচে। কাল থেকেই আমি আবার অসুখে পড়ব—তখন তুমি আমার সেবা করবে।

—থাক, অত শখের দরকার নেই।

প্রিয়ব্রত মাধুরীর কোমরের ওপর হাত রেখে বলল, এই ক'দিন তুমি বেশ রোগা হয়ে গেছ।

মাধুরী প্রিয়ব্রতর হাতখানা নিজের হাতে তুলে নিল। আঙুলে আঙুল ঘষতে ঘষতে বলল, তুই আমাকে নিয়ে এত মাথা ঘামাচ্ছিস কেন? তোর বন্ধুদের কথা বল। রুচিরার কি খবর?

—আমাকে একদম পাত্তা দেয় না।

—কেন?

—কি জানি!

—তোর মতন ছেলেকেও পাত্তা দেয় না যে মেয়ে, সে কি রকম?

—মেয়েরা কেউই আমাকে পাত্তা দেয় না। অথচ দ্যাখ সুভদ্রটা কি ন্যাকি! রুচিরা আর ঝর্ণা দু'জনেই সুভদ্রর জন্য পাগল—আর আমরা যেন কেউ না!

—সুভদ্রকে বুঝি খুব ভাল দেখতে?

—মোটেই না। কিন্তু খুব চুল উস্কো-খুস্কো করে থাকে, গান গাইতে পারে, হাই হাই ফিলসফির কথা বলে, গাড়ি চালায় খুব জোরে।

—তা হলে তো ছেলেটির অনেক গুণ। কিন্তু এরা দু'জন ছাড়া আর কোন মেয়ে নেই কলকাতা শহরে?

—কলকাতা শহর তো মেয়েতে ভর্তি। কিন্তু আমার সঙ্গে তাদের আলাপ হবে কি করে?

—খুব বুঝি ইচ্ছে হয়েছে এখন মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করার?

—একটু একটু হয়েছিল এক সময়। এখন আর না। মেয়েরা বড্ড ট্রেচারাস।

—কেন, তোর সঙ্গে কে কি ট্রেচারি করল!

—ধ্যেৎ! কলকাতার মেয়েদের মাথামুণ্ডু কিছু বোঝা যায় না। এরা একদম অন্যরকম।

—তোর সঙ্গে কে কি করেছে বল তো!

—ঝর্ণা মেয়েটা ভীষণ পাজী।

—কি করেছে ঝর্ণা?

—ও আমাকে ভালোবাসে না। আমিও ওকে ভালোবাসি না। কিন্তু ও আমাকে সব সময় লোভ দেখায়। আমারও একটু একটু লোভ হয়।

—কিসের লোভ?

প্রিয়ব্রত হাসতে হাসতে মাধুরীর চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকানি দিয়ে বলল বৌদি, তুমি এখনো ছেলেমানুষ রয়ে গেলে। তুমি কিচ্ছু বোঝ না?

—আর তুই কবে হঠাৎ এত বড় হয়ে গেলি?

—বাঃ হব না? গত মাসে আমি বাইশে পা দিয়েছি।

—সেইটাই তো খেয়াল করিনি—তুই কবে হঠাৎ বড় হয়ে গেলি। তোর যদি বাইশ হয়, আমার তা হলে একত্রিশ! ইস্, বুড়ি হয়ে গেলুম।

—একত্রিশ বছরে কেউ বুড়ি হয়? লেডি রাণুকে দেখেছ?

তুই ঝর্ণাকে একদিন এ বাড়িতে নিয়ে আয় না। আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিবি।

—না, না, ওসব হালকা টাইপের মেয়ে! আচ্ছা বৌদি, একটা কথা বল তো? সেদিন জ্বরের ঘোরে আমাকে দেখে তুমি বেশ কয়েকবার কে কে বলে চেঁচিয়ে উঠেছিলে কেন?

—কি জানি। হঠাৎ তোকে দেখে বোধহয় চিনতে পারি নি।

—হঠাৎ তো নয়—তুমি দু'তিনবার এরকম করেছিলে—খুব যেন চমকে উঠেছিলে।

—আমার মনে নেই!

—হ্যাঁ, মনে আছে। কি ভেবেছিলে বল ?

মাধুরী মুখটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিল। দীর্ঘশ্বাস চেপে বলল, সত্যি মনে নেই।

প্রিয়ব্রত আরও সরে এসে মাধুরীর গলার কাছে হাত রেখে বলল, কাতুকুতু দিয়ে দেব বলছি। শিগ্গির বলো—

—তুই আয়নায় তোর মুখটা দ্যাখ।

—রোজই তো দেখি। কি হয়েছে কি ?

—তুই কিছু বুঝতে পারিস না ? তোর চেহারা অবিকল তোর দাদার মতন হয়ে গেছে এখন। প্রথম যখন ওকে দেখেছিলাম, ঠিক এই রকম।

—সত্যি ?

—দেরাজে ছবি আছে, মিলিয়ে দ্যাখ।

—অনেকে বলে বাবার সঙ্গে আমার চেহারার খুব মিল আছে—

—তার চেয়েও বেশী তোর দাদার সঙ্গে। আগে এতটা বোঝা যেত না—প্রিয়ব্রত গম্ভীর হয়ে গেল। উঠে বসল। আঙুলের নোখ দিয়ে মাধুরীর গালের ওপর রেখা কেটে কেটে বলল, পরীক্ষাটা হয়ে যাক। তারপর আমি বেরিয়ে পড়ব।

—কোথায় ?

—অনেকদিন দাদার কথা মনে পড়ে নি। ছোটবেলায় আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, দাদাকে আমি খুঁজে আনবই, ভুলে গিয়েছিলাম সে কথা।

—থাক, তার আর দরকার নেই!

—নিশ্চয় পাব—বেঁচে যদি থাকে।

—সে বেঁচে নেই।

—হাউ ক্যান ইউ বি শো শিওর ?

—আমি জানি। থাক ও কথা। দাবার বোর্ডটা নিয়ে আয় তো—অনেকদিন দাবা খেলি নি।

—খেলবে ? নিয়ে আসছি।

প্রিয়ব্রত উঠে গিয়ে দাবার সরঞ্জাম নিয়ে এল। সাজিয়ে নিয়ে দুজনে বসল গম্ভীর হয়ে। মাধুরী খেলে শান্ত ধৈর্যের সঙ্গে—প্রিয়ব্রত একটু তাড়াহুড়ো করে। মাধুরীর বোড়ের চালে প্রিয়ব্রতর মন্ত্রী বিপন্ন হওয়ায় সে ভাবতে লাগল গালে হাত দিয়ে। একটু বাদে বলল, তোমার সঙ্গে সত্যি পারা মুশকিল। জাফরদা খুব ভাল খেলত।

মাধুরী বলল, অনেকদিন তোর দিদির কোন খবর পাই নি।

—পরিতোষদা বিলেত যাবে শুনছিলাম।

—যদি তোর দিদিকেও নিয়ে যায়—তা হলে ওখানে জাফরের সঙ্গে দেখা হতে পারে!

—তা নিয়ে যাবে না—জাফরদা তো গত বছর ফিরে এসেছে।

—তুই রাজা সরালি না ? মাত হয়ে যাবি তো এবার।

—তুমি বড্ড স্বার্থপর বৌদি। একদিনও আমাকে জিততে দাও না কেন ?

এই সময় পাশের ঘর থেকে কিসের যেন একটা আওয়াজ হল। মাধুরী উৎকর্ণ হয়ে বলল, মা বিছানা থেকে উঠতে যাচ্ছেন নাকি ? দ্যাখ তো—

খেলা ফেলে রেখে প্রিয়ব্রত দেখতে গেল পাশের ঘরে।

মাধুরী সেরে ওঠবার পর কয়েকদিনের মধ্যে মারা গেলেন মন্দাকিনী। বছর দু'-এক ধরে এ বাড়িতে তাঁর অস্তিত্বই টের পাওয়া যেত না। সুতরাং তাঁর মৃত্যুর মধ্যে কোন আকস্মিকতা নেই। শুধুই এইটুকুই আশ্চর্য যে মৃত্যুর দিন সাতেক আগে তাঁকে দেখে মনে হয়েছিল—তিনি বোধহয় এবার সেরে উঠবেন। মুখ-চোখ অনেকটা পরিষ্কার, নিজেই বিছানা থেকে একটু একটু হাঁটতেও লাগলেন। প্রিয়ব্রতকে কাছে পেলেই মাথায় হাত বুলোন। ফিস ফিস করে বলেছেন, প্রিয়, তোর ওপর অনেক দায়িত্ব—বাবাকে দেখিস, বৌদিকে দেখিস।

মৃত্যুর মাত্র কয়েকঘণ্টা আগে তিনি মাধুরীকে একা পেয়ে বলেছিলেন, বৌমা, আর আমার হাতে বেশী সময় নেই। তোমাকে একটা কথা বলে যাওয়া দরকার। দেবু আমার নিজের ছেলে নয়। তবু আমার নিজের ছেলেমেয়ের চেয়েও আমি তাকে বেশী ভালবাসতাম। সে-ই আমার মন ভেঙে দিয়ে গেছে। একথা এতদিন বলি নি, তোমার শ্বশুরের সম্মানের জন্য।

মাধুরীর মনে হলো, অসুখে ভুগে ভুগে মন্দাকিনীর বোধহয় মাথার গোলমাল হয়ে গেছে। এসব তিনি কি বলছেন? দেবব্রতর শোকেই তিনি শয্যাশায়ী হলেন, আর আজ বলছেন, দেবব্রত তাঁর ছেলে নয়। এর মানে কি?

মন্দাকিনী আবার বললেন, দেবু আমার মন ভেঙে দিয়ে গেল। আমি ওকে এত ভালবাসতাম—

শেষ পর্যন্ত তিনি দেবব্রতর নাম উচ্চারণ করতে করতেই মারা গেলেন।

শাশুড়ির মৃত্যুতে মাধুরী শোক করারও অবকাশ পেল না—ঐ উদ্ঘাটনে এমন স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। দেবব্রত মন্দাকিনীর ছেলে নয়? তবে সে কার ছেলে? একথা কেউ তাকে এতদিন ঘুণাক্ষরেও জানায় নি?

মাধুরীর মনের মধ্যে একটা প্রবল আলোড়ন এল নতুন করে। মানুষের জীবনে যে এরকম সব গভীর গোপন রহস্য থাকে—আগে সে কল্পনাও করে নি। বাইরে থেকে কত রকম আপাতসুখী সংসার দেখা যায়—আড়ালে কে কি গোপন করে রেখেছে কেউ জানে না। মন্দাকিনীর ছেলে নয়—তবে কি গগনেন্দ্রর আর কোন স্ত্রী ছিল? থাকলেই বা তাকে বলা হয় নি কেন?

সেই সব প্রশ্ন কাকে জিজ্ঞেস করবে—তা-ও মাধুরী বুঝতে পারল না। প্রিয়ব্রত ছাড়া সে-রকম আর নেই। কিন্তু প্রিয়ব্রত ছেলেমানুষ—সে-ও নিশ্চয়ই এসব কিছু জানে না। জানলে মাধুরীকে

বলতই। গগনেন্দ্রকেই বা মাধুরী মুখ ফুটে জিজ্ঞেস করবে কি করে? মন্দাকিনী এতদিন যখন বলেন নি—তখন গগনেন্দ্রর নিশ্চয়ই খুব একটা দুর্বল জায়গা আছে। কিংবা, কথাটা যদি সত্যি না হয়? হয়তো অসুখের ঘোরে এটা মন্দাকিনীর প্রলাপ! হয়তো তাই। নিশ্চয়ই তাই।

মন্দাকিনীর মৃত্যুর পর এই সংসারে আবার দুটি বড় রকমের পরিবর্তন ঘটে গেল। গগনেন্দ্র হঠাৎ খুব ঠাকুর-দেবতার ভক্ত হয়ে গেলেন। বাড়িতে পুজো-আচ্চা করে সময় কাটান—প্রতিদিন সন্ধ্যেবেলা কাছাকাছি এক সাধুর আশ্রমে খোল-করতাল সহযোগে নাম-গান করে অনেক রাত্তিরে বাড়ি ফেরেন। সংসারের ব্যাপারে তিনি এখন সম্পূর্ণ উদাসীন।

মাধুরীও তার কপাল থেকে সিঁদুরের দাগ মুছে ফেলল। দেবব্রতর কোন চিহ্নই রাখল না। সে এখন আর কারুর পরিত্যক্তা স্ত্রী নয়। সে এখন এই পৃথিবীতে একা।

॥ ১০ ॥

কিন্তু এই একাকীত্ব যে কত দুর্বিষহ মাধুরী সেটাও বুঝতে পারে পদে পদে। শুধু যে তার ভেতরে ভেতরে জ্বালা রয়েছে তাই-ই নয়। এই পৃথিবীও তাকে একা থাকতে দিতে চায় না। নানারকম কৌতূহল, নানা দিক থেকে লোভী চোখ তার গায়ে বেঁধে।

তাদের পাড়ারই একটি ছেলে ইদানীং সবসময় ছায়ার মতন তাকে অনুসরণ করে। ছেলেটি অত্যন্ত লম্বা, খুব পান খায়, মাথাভর্তি চুল। সে কথা বলার সাহস পায় না, কি চায় তাও জানায় না। মাধুরীর পেছনে পেছনে ঘোরা তার আনন্দ। মাধুরী স্কুলে যাবার সময় সেই ট্রামে ওঠে। অনেক সময় ফেরার পথেও তাকে দেখা যায়। কতদিন ধরে সে এরকম করছে কে জানে—মাধুরীর চোখে পড়েছে

মাত্র কিছুদিন। মাধুরীর শরীরে এখনও রূপ আছে—এবং রূপ সব সময়েই অপরের উপভোগ্য।

অসুখ থেকে সেরে ওঠার পরও মাধুরীর শরীরে অন্য একটা অসুখ দানা বেঁধেছে। শরীরে কিংবা মনে। হঠাৎ হঠাৎ মাধুরীর শরীরটা ঝিম ঝিম করে ওঠে, মনে হয় যেন সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবে—সেই অবস্থায় আশেপাশের কিছু আঁকড়ে না ধরলে তার পড়ে যাওয়ারই কথা। মাত্র দু'এক মিনিট থাকে এই অবস্থা—তারপরেই সামলে নেয়। দশ-বারো দিন অন্তর অন্তর এরকম এক একবার হয়। কেন হয় কে জানে। মাধুরীর ব্লাডপ্রেসারও স্বাভাবিক।

স্কুল ছুটি ছিল, মাধুরী এসপ্লানেডে গিয়েছিল কয়েকটা টুকি-টাকি জিনিসপত্র কিনতে। ফেরার সময় ট্রামের জন্য দাঁড়িয়ে আছে লিন্ডসে স্ট্রীটের মোড়ে। ট্রাম আসতে দেরি করছে, এই সময় সুট-পরা একজন লোক মাধুরীর কাছ ঘেঁসে দাঁড়াল। মাধুরীর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই হাসল লোকটি। মাধুরী অবাক। লোকটিকে সে আগে কখনো দেখেনি তো। মুখ নিচু করে মাধুরী মনে করার চেষ্টা করতে লাগল লোকটির সঙ্গে কোথাও পরিচয় হয়েছিল কিনা। মনে তো পড়ে না।

লোকটি আরও কাছ ঘেঁষে এল। হাসিমুখেই জিজ্ঞেস করল, কোন দিকে যাবেন?

জবাব না দিয়ে মাধুরী লোকটির দিকে তাকাল।

সদ্য বিকেল শেষ হয়েছে, এখনো সন্ধ্যে নামে নি। রাস্তায় গিজ গিজ করছে মানুষ। অন্য যে-কেউ মাধুরী আর সেই লোকটিকে দেখে ভাববে—ওরা বহুকালের পরিচিত, অন্তরঙ্গভাবে কিছু গল্প করছে।

লোকটি চোখ দিয়ে মাধুরীকে ময়দানের দিকে আসবার জন্য ইশারা করল। তখন মাধুরী বুঝতে পারল ব্যাপারটা। সে চোখ নামিয়ে নিল, তার শরীর কাঁপছে।

ঠিক সেই সময় এসে হাজির হল মাধুরীদের পাড়ার সেই লম্বা-চুল ছেলেটি। সে নিশ্চয়ই কাছাকাছি কোথাও দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করছিল। সে এসে সুট-পরা লোকটিকে রুক্ষ গলায় জিজ্ঞেস করল, কি চাই আপনার? কি চাই? মেয়েছেলের অসম্মান করছেন?

ঘৃণায় রি রি করতে লাগল মাধুরীর শরীর। নিজেকে তার মনে হল একটা কুকুরী। একটা কুকুরীর জন্য আর দুটো কুকুর ঝগড়া করছে, এ দৃশ্য রাস্তায় অনেক সময় দেখতে পাওয়া যায়।

ট্রাম আসতেই ট্রামের পা-দানিতে উঠে পড়ল মাধুরী। সঙ্গে সঙ্গে তার সেই শরীরের মধ্যে ঝিম ঝিম করা শুরু হল। অতি কষ্টে আর এক পা উঠল, একজন বয়স্কা মহিলা দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁকে জড়িয়ে ধরল। মহিলাটি অবাক হয়ে ফিরে তাকিয়ে বললেন, কি হয়েছে? এরকম করছেন কেন?

মাধুরী ততক্ষণ নিজেকে সামলে নিয়েছে। ক্লিষ্টভাবে হেসে বলল, কিছু মনে করবেন না। হঠাৎ মাথাটা ঘুরে গিয়েছিল।

দু'জন লোক শশব্যস্ত হয়ে বসবার জায়গা ছেড়ে দিল মাধুরীকে।

মাধুরী ভাবল, কোনদিন হয়তো রাস্তার মধ্যেই সে মাথা ঘুরে পড়ে যাবে। হয়তো এই ভাবেই মৃত্যু আসছে তার। আসুক। তাড়াতাড়ি আসুক। আর ভাল লাগে না।

ট্রাম-বাস এড়িয়ে যতদূর সম্ভব ট্যাক্সি করে যাতায়াত শুরু করেছিল। তাতেও একদিন সাংঘাতিক বিপদ ঘটতে যাচ্ছিল। স্কুলের কাছ থেকে ট্যাক্সি নিয়েছে মাধুরী, ভবানীপুরের কাছে এসে ট্যাক্সিওয়ালা হঠাৎ অনুনয় করে বলল, মাইজী, এক মিনিট, এই দোকানসে—। ট্যাক্সিটা থামাবার সঙ্গে সঙ্গে আরও দু'জন লোক এসে উঠল ট্যাক্সির সামনের সীটে এবং ট্যাক্সিওয়ালা গাড়িটা বাঁদিকের গলিতে ঘোরালো। মাধুরী ভয় পেয়ে বলল, ওদিকে যাচ্ছ কেন? সোজা—টালিগঞ্জ।

ট্যাক্সিওয়ালা কঠোরভাবে বলল, উধার রাস্তা জ্যাম হ্যায়।

সেদিন মাধুরীর ভাগ্যে কি ঘটত কে জানে। বেঁচে গেল প্রায় অলৌকিক উপায়ে। লোকগুলি মাধুরীর কথা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে দ্রুতগতিতে ট্যাক্সি চালাচ্ছিল অন্যদিকে। মাধুরীর তখন চাঁচাবার সাধ্য পর্যন্ত নেই, গলা শুকিয়ে গেছে, শরীর কাঁপছে। চাঁচালে বিশেষ সুবিধে হত বলে মনে হয় না। কিন্তু গলি ছেড়ে ট্যাক্সিটা বড় রাস্তাতে পড়তেই ট্রাফিক জ্যাম। সামনে একটা অ্যাকসিডেণ্ট হয়েছে, লোকজন ছুটছে সেইদিকে। তখন আর এ ট্যাক্সির ঘোরার উপায় নেই। তৎক্ষণাৎ ট্যাক্সিওয়ালা ও তার সঙ্গী দু'জন গাড়ি রেখেই লম্বা লম্বা পা ফেলে দৌড়ে পালিয়ে গেল।

এরপর থেকে মাধুরী আর পারতপক্ষে বাড়ি থেকে বেরোয় না। ইস্কুলে যায়, ফিরে আসে। বিশেষ কোন প্রয়োজন থাকলে প্রিয়ব্রতকে বলে। প্রিয়ব্রতও ব্যস্ত থাকে। সবসময় তাকে পাওয়া যায় না।

এরই মধ্যে একজন মানুষের সঙ্গে মাধুরীর বন্ধুত্ব হয়ে গেল। সে হচ্ছে ওদের স্কুলের অংকের শিক্ষক জীবনলাল। অন্য কোন শিক্ষয়িত্রী ওকে পছন্দ করে না। করবী ঐ মানুষটিকে বলেছিল অপয়া।

স্কুল থেকে ফেরার পথে ট্রাম-স্টপে প্রায়ই দেখা হয় জীবনলালের সঙ্গে। অন্য মেয়েরা ওর সঙ্গে এক ট্রামে ওঠে না, কারণ ওর সঙ্গে দেখা হলেই সেদিন নাকি কারুর না কারুর শাড়ি ছেঁড়ে কিংবা পয়সা হারায়। কিংবা ট্রাম অনেক দেরীতে পৌঁছয়। মাধুরী এসব শুনে হাসে।

মাধুরী একদিন ট্রামে করে বাড়ি ফিরছে, দেখল তার সীটের কাছেই জীবনলাল দাঁড়িয়ে আছে। মাধুরীর সঙ্গে একবার চোখাচোখি হতেই চোখ ফিরিয়ে নিল। কথা বলার তো প্রশ্নই ওঠে না। স্কুলের কেউই ওর সঙ্গে বিশেষ কথা বলে না। লোকটিকে স্কুলে রাখা হয়েছে দুটি কারণে—লোকটি দেখতে ভাল নয়, এবং অঙ্ক সত্যিই ভাল জানে।

মাধুরীর হঠাৎ মনে হল, এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার ছাড়া আর কি? একই স্কুলের সহকর্মী—বছরের পর বছর একসঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে—অথচ কখনো কথা বলা হয় না—এর কোন মানে হয়? এত অবজ্ঞা বা অবহেলাতেও লোকটির গায়ে কোন আঁচড় লাগে না?

মাধুরীর পাশের মেয়েটি উঠে যেতেই একটি জায়গা খালি হল। মাধুরী তখন জীবনলালের দিকে ফিরে বলল, আপনি বসুন।

জীবনলাল শুনতে না পাবার ভান করে তাকিয়ে রইল অন্য দিকে। অন্য আর দু একজন লোক ঐ জায়গাটায় বসে পড়ার জন্য উসখুস করছে। মাধুরী আবার জীবনলালের দিকে তাকিয়ে একটু জোরে বলল, আপনি বসুন না!

অন্য লোক দু'তিনটিই জীবনলালকে পেড়াপিড়ি করল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, বসে পড়ুন, বসে পড়ুন!

অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে বসল জীবনলাল—মাধুরীর দিকে তাকাল না, অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রইল। মাধুরী মনে মনে হাসতে লাগল। মুখ দেখে মনে হচ্ছে, জীবনলালকে খুব একটা বিপদে ফেলা হয়েছে।

জীবনলালের বয়েস চল্লিশের নিচে, তবু চুলে এর মধ্যেই বেশ পাক ধরেছে। চুখখানা বিষণ্ণ ধরনের।

মাধুরী ওর দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, জীবনলালবাবু, আপনি কোনদিকে থাকেন? টালিগঞ্জের দিকে?

জীবনলাল একেবারে চমকে উঠল। ব্যস্ত হয়ে বলল, আমি? না—মানে, হ্যাঁ, এই—

জীবনলাল মাধুরীদের বাড়ির দু'তিন স্টপ আগেই থাকে। এই কথাটুকুও সে বোঝাতে পারল না। যেন জীবনে এই প্রথম কোন নারী তার সঙ্গে কথা বলছে—নারীদের সঙ্গে কিভাবে কথা বলতে হয় সে জানে না।

মাধুরী আবার বলল, আপুনি মাঝখানে অনেকদিন স্কুলে আসেন নি। অসুখ-টসুখ করেছিল?

এবার জীবনলাল মাধুরীর দিকে সম্পূর্ণ চোখে তাকাল। নির্নিমেষ সেই তাকানোর ভঙ্গি। সেইভাবে বলল, না, অসুখ করে নি। একটা কাজে গিয়েছিলাম।

আর একটি মেয়ে এসে গেছে, জীবনলালকে সীট ছাড়তে হল। সেদিন আর কোন কথা হল না। সেদিন ট্রাম থেকে নামবার সময় একটি ছেলের বেল্টে খোঁচা লেগে ফ্যাঁস করে মাধুরীর শাড়ির আঁচলটা খানিকটা ছিঁড়ে গেল। মাধুরী মনে মনে ভাবল, জীবনলালকে যে সবাই অপয়া বলে তাহলে তো সেটা সত্যি দেখছি! বেশ মজার ব্যাপার তো!

পরদিন মাধুরী ইচ্ছে করে জীবনলালের সঙ্গে এক ট্রামে উঠল। সেদিন জীবনলাল কোথায় যে ভীড়ের মধ্যে লুকিয়ে রইল দেখাই গেল না। সেদিনও মাধুরীর চটির স্ট্র্যাপ ছিঁড়ে গেল। তখন জেদ ধরে গেল মাধুরীর। পরের দিন আবার ফিরল জীবনলালের সঙ্গে। সেদিন ট্রামের তার ছিঁড়ে গিয়ে আটকে রইল দেড় ঘণ্টা। ততক্ষণ বসে থাকা যায় না। মাধুরী ট্রাম থেকে নেমে হাঁটতে শুরু করল— সামনেই জীবনলাল।

জীবনলাল মাধুরীকে দেখে দ্রুত পা চালিয়ে হন হন করে সরে পড়বার উদ্যোগ করছিল, মাধুরী বলল, দাঁড়ান। জীবনলাল কাঠের মূর্তির মতন দাঁড়িয়ে পড়ল। লোকটা সত্যিই অদ্ভুত।

মাধুরী কাছে এসে বলল, চলুন, একসঙ্গে যাই।

প্রথম দু'এক মিনিট দু'জনেই নিস্তব্ধ। জীবনলাল তো কথা বলবেই না—মাধুরীও কি বলবে ভেবে পাচ্ছে না। তখন এসে পড়ল স্কুলের প্রসঙ্গ। মাধুরী বলল, আচ্ছা, মন্দিরা অন্য সব সাবজেক্টে এত ব্রিলিয়ান্ট—আমরা ভেবেছিলাম স্ট্যান্ড করবে—কিন্তু অঙ্কে এত খারাপ করল—

জীবনলাল সংক্ষেপে বলল, ওর দ্বারা অঙ্ক হবে না। ওকে আর্টস নিয়ে পড়তে বলুন।

—আর্টস পড়লে বুঝি অঙ্ক পারতে নেই?

—সবাই পারে না!

—তা ঠিক। আমারও অঙ্ক একদম মাথায় ঢুকত না। বড্ড নীরস ব্যাপার।

—অঙ্ক মোটেই নীরস নয়।

আস্তে আস্তে জীবনলালের মুখ খোলে। শুধু প্রশ্নের উত্তর নয়, নিজে থেকেও সে কিছু কিছু বলে। লোকটির কথাবার্তা বলার ধরন একটু রুক্ষ। কিন্তু বোঝা যায়, সে যা বলছে, আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করেই বলছে।

হাঁটতে হাঁটতেই জীবনলাল এক জায়গায় থমকে দাঁড়াল। রাস্তার ওপরে একটা বাড়ি দেখিয়ে বলল, এইটা আমার বাড়ি। আপনাকে এগিয়ে দেব?

—না, না, তার দরকার নেই।

—দিতে পারি। আমার হাতে কোন কাজ নেই। এখনও ট্রাম বন্ধ।

—আমি এমনি চলে যেতে পারব।

—আচ্ছা ঠিক আছে—

আর কোন কথা না বলে জীবনলাল নিজের বাড়ির দরজার দিকে চলে যাচ্ছিল কি ভেবে আবার ফিরে এসে বলল, আপনি ইচ্ছে করলে আমার বাড়িতে একটু বসতে পারেন। ততক্ষণে যদি ট্রাম চলে—

লোকটির ধরনধারণ দেখে মাধুরীর কৌতূহল বাড়ছিল। নিছক কৌতূহলের বশেই মাধুরী বলল, ঠিক আছে। চলুন!

বাড়িটি ফ্ল্যাট-বাড়ি। চারতলায় ছাদের ওপর একটি মাত্র ঘরে থাকে জীবনলাল। খুবই ছোট ঘর—সেখানে এসে মাধুরী অপ্রস্তুত বোধ করল। জীবনলালের কোন লজ্জা-টজ্জা নেই। খাটের তলা থেকে সে একটি বেতের মোড়া বার করে দিয়ে বলল, বসুন।

ঘরখানা দেখলেই মনে হয় দুঃখী মানুষের ঘর। আসবাবপত্র বিশেষ কিছুই নেই—কোনদিন কোন মেয়েলী হাতের স্পর্শ পড়েনি

সে ঘরে। শুধু একটি চৌকির ওপর সতরঞ্চি ও চাদর পাতা। ঘরের কোণে মেঝেতেই রাখা খান কয়েক বই—একটা জলের কুঁজো। এত অল্প আসবাবে যে কোন মানুষ জীবন কাটাতে পারে—ঠিক কল্পনা করা যায় না। জীবনলাল যে শুধু মানুষজনের সঙ্গই পায়নি তা নয়—সে জিনিসপত্রের সঙ্গও চায় না।

মাধুরী জিজ্ঞেস করল, আপনি একা থাকেন? আর কেউ নেই?

জীবনলাল উল্টে প্রশ্ন করল, আর কে থাকবে?

মাধুরী চুপ করে গেল। জীবনলালের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে সে কিছুই জানে না! এ সম্পর্কে বেশী প্রশ্ন করাও ঠিক নয়। সে এখানে না এলেও পারত।

জীবনলালের হঠাৎ খেয়াল হল মাধুরীকে একটু আপ্যায়ন করা দরকার। বলল, বসুন, একটু চা নিয়ে আসছি।

মাধুরী ব্যস্ত হয়ে বলল, না, না, চায়ের দরকার নেই।

জীবনলাল সে কথায় কর্ণপাত করল না। বলল, বেশী দেরী হবে না, আসছি এক্ষুনি।

কোথায় চা আনতে গেল কে জানে। মাধুরী বসে আছে তো বসে আছে। আচ্ছা ফ্যাসাদ তো!

বেশ কিছুক্ষণ বাদে জীবনলাল একটা কেটলি আর একটি মাত্র কাপ নিয়ে ফিরল। মাধুরীকে কাপে চা ঢেলে দিয়ে নিজে একটা কাচের গেলাস নিয়ে চায়ে ভর্তি করে ফেলল।

মুখে দিয়েই বোঝা যায় দোকানের চা। স্বাদ ভাল না। সঙ্গে একটা বিস্কুট বা কিছু আনেনি—সাধারণত লোকে আনে। মাধুরীর চা শেষ হবার পর জীবনলাল জিজ্ঞেস করল, আর একটু নেবেন?

মাধুরী বলল, না।

জীবনলাল নিজেই আবার গেলাস ভর্তি করে নিল এবং খেয়ে ফেলল খুব পরিতৃপ্তির সঙ্গে। মনে হয়, এইটাই তার বিকেলের খাবার।

তারপর সে আকস্মিকভাবে মাধুরীকে জিজ্ঞেস করল, আপনি

আমার সঙ্গে এক ট্রামে ওঠেন কেন? জানেন না আমি অপয়া?

মাধুরী যেমন চমকে উঠল, তেমনি লজ্জাও পেল। অন্য শিক্ষয়িত্রীরা নিজেদের মধ্যে জীবনলালকে অপয়া বলে বটে, কিন্তু কখনো ওকে শুনিয়ে তো বলে না। লোকটি এমনি চুপচাপ থাকলে কি হয়, সব কিছু লক্ষ্য করে।

মাধুরী হেসে বলল, আপনি অপয়া বুঝি?

জীবনলাল হাসল না। গম্ভীর ভাবে বলল, হ্যাঁ। সারা জীবন ধরেই আমি অপয়া। আমার নিজেরই সব কিছু নষ্ট হয়ে যায়।

—আপনি মেয়েদের ইস্কুলে মাস্টারী করেন কেন?

—মেয়েদের ইস্কুলে বেশী টাকা দেয়। আগে ছেলেদের ইস্কুলে করতাম।

—শুধু টাকার জন্য?

—তা ছাড়া আর কি?

মাধুরীর বলতে ইচ্ছে করল, ছেলেদের স্কুলে পড়ালে তবু পাঁচজনের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারতেন, কথা বলার লোক পেতেন। তার বদলে মেয়েদের স্কুলে এই মুখ বুজে চাকরি করা কি ভাল? কিন্তু সে কথা বলল না। হয়তো এমন লোকও আছে—যারা মানুষজনের সঙ্গে মেলামেশা করা পছন্দ করে না।

জীবনলাল আবার বলল, তবে, আমি আর মাত্র কয়েক মাস চাকরি করব, তারপর চলে যাব।

—অন্য স্কুলে?

—না, আর কোন চাকরিই করব না, এখান থেকে চলে যাব।

—কোথায়?

—অনেক দূরে একটা জায়গায়।

রাস্তায় ট্রাম চলার কর্কশ শব্দ শোনা গেল। জীবনলাল বলল, ট্রাম চলছে, এবার আপনি যেতে পারবেন। আমাকেও টিউশানি করতে যেতে হবে।

এই জীবনলাল। এই অপয়া রুক্ষ লোকটি সম্পর্কেই মাধুরী একটু আকর্ষণ বোধ করতে লাগল। তার ইচ্ছে হয়, লোকটির বাইরের কঠিন আবরণ ভেদ করে ভেতরটা দেখতে। মাঝে মাঝেই দেখা হয় জীবনলালের সঙ্গে। মাধুরীরও তো কথা বলার একজন লোক দরকার। জীবনলাল কখনো তার সঙ্গে অসৎ ব্যবহার করে না।

প্রিয়ব্রতর বন্ধুবান্ধবরা আজকাল প্রায়ই তার বাড়িতে আসে। মাঝে মাঝে দু' একটি মেয়েকেও দেখা যায়। প্রিয়ব্রত আজকাল ওদের নিয়ে খুব ব্যস্ত। তাদের ইউনিয়নের মিটিং নিয়ে ঘন ঘন মিটিং বসে তার বাড়িতে। সুভদ্রর বিরুদ্ধে প্রিয়ব্রত ইলেকশানে দাঁড়াচ্ছে।

স্কুল থেকে ফিরে একদিন মাধুরী দেখল, তিনতলার সিঁড়ি দিয়ে প্রিয়ব্রতর সঙ্গে দুটি ছেলে আর একটি মেয়ে নামছে। তারা গভীর মনোযোগে কথা বলায় ব্যস্ত। মাধুরী একপাশে সরে দাঁড়াল।

মেয়েটির পরনে আগুন রঙের লাল শাড়ি, মুখের ভঙ্গিখানা অহংকারী। মাধুরী ভাবল, কে এই মেয়েটি, ঝর্ণা না রুচিরা? একবার ভাবল, সে নিজে থেকে ডেকে ওদের সঙ্গে আলাপ করবে। আবার লজ্জায় চুপ করে রইল। ওরা নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত আছে—কি দরকার। অহংকারী হলেও মেয়েটি বেশ সুশ্রী। অহংকার তো থাকবেই—কুমারী বয়েসে ঐ রকম অহংকার মানায়।

প্রিয়ব্রত বেরিয়ে গিয়েছিল ওদের সঙ্গে। কখন ফিরেছে মাধুরী টের পায় নি। রাত্তিরবেলা খাওয়ার সময় দোতলা থেকে কয়েকবার প্রিয়ব্রতর নাম ধরে ডাকাডাকি করেও সাড়া পাওয়া গেল না। মাধুরী উঠে গেল তিনতলায়।

ঘরে আলো জ্বলা, প্রিয়ব্রত ঘুমিয়ে পড়েছে খাটের ওপর। মাধুরী দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে রইল কয়েক মিনিট। অনেকদিন পর তার চোখে জল এসে গেল। ঠিক যেন মনে হয় দেবব্রত শুয়ে আছে। ঠিক সেই ভঙ্গি। দেবব্রতর শোওয়ার ধরনও ছিল এই রকম এলোমেলো। একটা হাত খাটের বাইরে বেরিয়ে ঝুলছে। এই

রকম ভাবে-আলো জেলে ও যখন তখন ঘুমিয়ে পড়ত।

অনেকদিন হয়ে গেল, স্মৃতি এখন ঝাপসা। চোখের জলে আরও ঝাপসা। বিকেলবেলা প্রিয়ব্রত যখন ঐ আগুন-রঙা শাড়ি পরা অহংকারী মেয়েটির সঙ্গে সিঁড়ি দিয়ে নামছিল—তখনও এক পলকের জন্য মনে হয়েছিল তরুণ দেবব্রতই যেন নেমে যাচ্ছে সিঁড়ি দিয়ে। একটু কি ঈর্ষা হয়নি মাধুরীর!

মাধুরী চোখের জল মুছে ভাবল, এসব কথা মনে আনার আর কোন মানে হয়? ওদের জীবন আলাদা, ওদের সুখ অন্যরকম। তবু কেন মাধুরীর চোখে জল আসে?

ভালো করে চোখ-মুখ মুছে নিজেকে স্বাভাবিক করে নিল মাধুরী। তারপর প্রিয়ব্রতর গায়ে ঠেলা দিয়ে বলল, এই প্রিয়, ওঠ, খাবি না?

প্রিয়ব্রত চোখ মেলে তাকাল। তারপর বলল, বৌদি? বসো একটু—

—চল, খেতে চল।

প্রিয়ব্রত হাত বাড়িয়ে মাধুরীকে ধরে বলল, একটু বসো না। পরে খাব।

মাধুরী খাটে বসল। প্রিয়ব্রত মাথাটা তুলে মাধুরীর কোলে রাখল। বাচ্চা ছেলের মতন মাধুরীর কোলে মাথা ঘষতে ঘষতে বলল, আজ আমার মনটা বড্ড খারাপ।

—কেন রে, কি হয়েছে?

—আমি ইলেকশানে হেরে গেছি!

—ও, এই ব্যাপার! যাক ভালোই হয়েছে! ওসব ইউনিয়ন টিউনিয়ান করলে কি পড়াশুনা হয়?

—তুমি বুঝতে পারছ না? আমি আবার সুভদ্রর কাছে হেরে গেলাম। সুভদ্রর কাছে আমি সব ব্যাপারে হেরে যাচ্ছি?

—দূর পাগল! এই নিয়ে কেউ মন খারাপ করে?

মাধুরী প্রিয়ব্রতর চুলে আঙুল ডুবিয়ে দিল। প্রিয়ব্রত মাধুরীর

মুখের দিকে তাকিয়ে রইল একদৃষ্টে। বলল, কাল ক্লাসে গিয়ে আমি মুখ দেখাতে পারব না।

—আজকে কারা এসেছিল? একটি মেয়েকে দেখলাম—ওর নাম কি রে?

—ঐ তো রুচিরা!

মাধুরী একটু চমকে উঠে বলল, রুচিরা? তুই যে বলেছিলি, রুচিরা সুভদ্রর বেশী বন্ধু? তাহলে তোর কাছে এসেছিল যে আজ?

—আমি আজ হেরে গেছি কি না! তাই সান্ত্বনা জানাতে এসেছিল। যারা হেরে যায়—তাদের প্রতি অনেকের খুব মায়া থাকে। এটা এক ধরনের চালিয়াতি, বুঝলে না?

—মেয়েটিকে কিন্তু বেশ ভাল দেখতে রে!

—মোটেই এমন কিছু ভাল দেখতে না। ওরকম মেয়ে ঢের দেখা যায়।

—ওমা! রেগে গেছিস বলে যে সুন্দর তাকে সুন্দর বলে স্বীকার করবি না?

—ছাই সুন্দর! ওর থেকে তুমি অনেক বেশী সুন্দর!

—আমি তো তোর চোখে সুন্দর হবই। সে কথা আলাদা।

—বৌদি, তোমার কাছে থাকলে যে-রকম শান্তি পাই, আর কোথাও সে-রকম পাই না।

—চল্ খেতে চল্।

—যাচ্ছি, যাচ্ছি, একটু বসো না!

—চল, খেয়ে নে, তারপর আবার গল্প করব।

—আমার উঠতে ইচ্ছে করছে না। আমার খাবারটা এখানে এনে খাইয়ে দাও না!

—কচি খোকা হচ্ছিস নাকি দিন দিন। ওঠ্!

—তোমার যখন বিয়ে হয় তখন আমি কতটুকু ছিলুম। সাত-আট বছর। তখনও তোমার কোলে মাথা দিয়ে শুয়েছি। কিন্তু

তখন আর এখন কত আলাদা। তখনকার চেয়েও তুমি এখন বেশী সুন্দর হয়েছ।

মাধুরী হাসতে হাসতে প্রিয়ব্রতর মাথাটা জোর করে তুলে দেবার চেষ্টা করে বলল, ওঠ্ ওঠ্ বলছি!

প্রিয়ব্রতও চেপে শুয়ে থেকে বলল, উঠব না, উঠব না! কি ভাল যে লাগছে।

নীচ থেকে গগনেন্দ্রনাথ গম্ভীর গলায় ডাকলেন, প্রিয়, মাধুরী! খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে!

প্রিয়ব্রত ধড়-মড় করে উঠে সাড়া দিল, যাচ্ছি।

মাধুরী প্রিয়ব্রতর দিকে ভ্রূকুটি করে বলল, দেরি করিয়ে দিলি তো? বাবা এতক্ষণ না খেয়ে বসে আছেন!

—বাবাকে আগে খাইয়ে দিলেই তো পার। সন্ধ্যা থেকে খুব নামগান করেন তো—ঐ জন্য বেশী খিদে পায়। ঠাকুর-দেবতার নাম করার বেশ উপকারিতা আছে।

মাধুরী ধমক দিয়ে বলল, সব তাতেই ফাজলামি?

অবাধ্য বালকের মতন প্রিয়ব্রত পেছন থেকে মাধুরীকে জড়িয়ে ধরে বন্দী করে ফেলে বলল, তুমি কি ভাল! তোমাকে একদম ছাড়তে ইচ্ছে করে না।

॥ ১১ ॥

জীবনলাল চার-পাঁচ দিন স্কুলে আসে নি। কেউ তা নিয়ে অবশ্য মাথা ঘামায় না। এই মানুষটির অনুপস্থিতি লক্ষ করে না আর কেউ। শুধু হেডমিস্ট্রেসকে আলাদা রুটিন করতে হয়, এই-টুকুই যা ব্যতিক্রম।

মাধুরীর কিন্তু একটু একটু অস্বস্তি হয়। ঘরে ফিরে মনে পড়ে ওর কথা। ক্লাসের সময়টুকু ছাড়া জীবনলালকে দেখা যেত ফাঁকা ঘরের চেয়ারে একা একা। ঠায় বসে থাকতে, কিংবা স্কুলের পেছনের বাগানটায় আপনমনে ঘুরে বেড়াতে। এর আগে কক্ষনো

সে ছুটি না নিয়ে কামাই করে নি, কিংবা কোনদিন এক মিনিটও দেরী করে আসে নি। বছরে একবার শুধু সে কয়েকদিনের ছুটি নিয়ে কোথায় যেন যায়। মাঝে মাঝে জীবনলালকে ছাড়িয়ে অন্য কোন মেয়েটিচার রাখার প্রস্তাব উঠেছে, কিন্তু হঠাৎ জীবনলালকে বরখাস্ত করার কোন যুক্তি পাওয়া যায় না। এই প্রথম জীবনলাল পর পর কয়েকদিন স্কুলে অনুপস্থিত, অথচ একটা খবরও পাঠায় নি।

কিছুদিন ধরে স্কুল ছুটির পর জীবনলালের সঙ্গেই একসঙ্গে ফেরা অভ্যেস হয়েছিল মাধুরীর। এই নিয়ে করবী আর সান্ত্বনা সূক্ষ্ম ইঙ্গিত করেছে। কিন্তু ঐ অপয়া লোকটির সঙ্গে পর পর কয়েকদিন গিয়ে মাধুরীর আর কোন অযাত্রা হয় নি। মনে মনে মাধুরী একটু হেসে ভেবেছে যে, সে নিজেও তো অপয়া—তাই কাটাকুটি হয়ে গেছে বোধহয়।

ট্রামে যাবার সময় জীবনলালের বাড়িটা চোখে পড়ে। একদিন ট্রাম থেকে নেমে পড়ল। একজন সহকর্মী যদি বাড়ির কাছাকাছি থাকে—তার সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়ায় দোষ কি? চারতলায় উঠে দেখল জীবনলালের ঘর তালাবন্ধ। তখন মাধুরীর খুব রাগ হল। চারতলা পর্যন্ত সিঁড়ি ভেঙে উঠে যদি কারুকে বাড়িতে না পাওয়া যায়—তা হলে খারাপ লাগেই। তালা যখন বন্ধ—তার মানে ওর অসুখ করে নি। তাহলে, স্কুলে কোন খবর পাঠায় নি কেন?

চারতলায় আর কোন ঘর নেই, কারুকে কিছু জিজ্ঞেস করাও যায় না। ফ্লাট-বাড়িতে কে-ই বা কার খবর রাখে। মাধুরী যখন ফিরে আসছিল, তখন মেজাজ বেশ খারাপ। সিঁড়ির নিচে জীবনলালের সঙ্গে দেখা হওয়ায় সে বেশ রাগের সঙ্গেই বলল, কোথায় ছিলেন?

জীবনলালের দু'হাত ভরা জিনিসপত্তর। নানারকমের কৌটো কাগজের প্যাকেট। জীবনলাল ওপরের সিঁড়িতে পা দিয়ে মাধুরীকে বলল, আসুন!

মাধুরী বলল একবার ওপরে উঠেছিলাম, আর যাব না। আপনি

স্কুলে আসছেন না কেন?

জীবনলাল আবার বলল, আসুন।

তারপর নিজেই সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল, মাধুরীর দিকে আর না তাকিয়ে। লোকটা ভারী অভদ্র তো, মাধুরীর উচিত ছিল না আসা। বেশ কয়েক ধাপ সিঁড়ি উঠে গিয়ে জীবনলাল আবার মুখ ফিরিয়ে বলল, কই, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? আসুন!

এই অবস্থায় মাধুরীর চলে যাওয়াটা নাটকীয় দেখায়। তাই মাধুরী অনিচ্ছাসত্ত্বেও ওপরে উঠে এল। তালা খুলে জীবনলাল বলল, আপনার বসতে অসুবিধে হবে, ঘরে একদম জায়গা নেই—

সত্যিই তাই। জীবনলালের ঘরে কোনই আসবাবপত্তর ছিল না, এখন একেবারে জিনিসপত্তর ঠাসা। নতুন কম্বল, মশারি বালিশ। কিছু বাসনপত্তর, হাঁড়ি, জলের জাগ, কেটলি। একখানা নতুন বঁটি পর্যন্ত। লোকটি কি নতুন বিয়ে করে সংসার পাতছে নাকি?

মাধুরী সে কথা জিজ্ঞেস করল না। চুপ করে দেখতে লাগল। জীবনলাল সাবধানে প্যাকেট ও কৌটোগুলো একটা বড় স্টিলের ট্র্যাংকে গুছিয়ে রাখল। ট্রাংকটাও নতুন। সেটা তালা বন্ধ করে জীবনলাল বলল, আজ আর চা আনতে নিচে যেতে হবে না—স্টোভ আছে, এখানেই চা তৈরি করে নিচ্ছি।

মাধুরী বলল, আমি চা খাব না। এখন তৈরী করার দরকার নেই। জীবনলাল বলল, আমি খাব। আপনি ইচ্ছা করলে খেতে পারেন।

জীবনলাল তখন স্টোভ ধরাতে বসল। এক একজন মানুষ সব রকম কাজই মোটামুটি ঠিকঠাক পারে। আবার এক ধরনের মানুষ সাংসারিক কাজে একেবারেই আনাড়ি হয়। জীবনলাল সেই ধরনের। তার স্টোভ ধরানো কিংবা জল ঢালার ভঙ্গি দেখলেই বোঝা যায়—এই সব কাজ সে জীবনে কখনো সুষ্ঠু ভাবে পারবে না।

মাধ্বরীর একবার ইচ্ছে হল, চা-টা সে-ই তৈরী করে দেয়। কিন্তু লোকটি কথাবার্তা যে রকম রূক্ষ—অযাচিত ভাবে সে এগলো না। জিজ্ঞেস করল, আপনি স্কুলে যাচ্ছেন না কেন ?

জীবনলাল মুখ তুলে পাল্টা প্রশ্ন করল, মিসেস বড়ুয়া বুঝি আপনাকে খোঁজ নিতে পাঠিয়েছেন ?

মাধ্বরী চুপ করে গেল। লোকটি কি ভেবেছে যে হেডমিস্ট্রেসের কথাতেই সে এসেছে ? কিন্তু এটা অস্বীকার করলে আবার বলে ফেলতে হয় যে মাধ্বরী নিজে নিজেই এসেছে। লোকটির এ রকম জেরা করার দরকার কি ?

জীবনলাল নিজে থেকেই বলল, আমার অনেক ছুটি পাওনা আছে।

—কিন্তু সামনেই মেয়েদের পরীক্ষা। এই সময় না বলে-কয়ে কেউ ছুটি নেয় না।

—মিসেস বড়ুয়ার বদলে আপনিই হেড মিস্ট্রেস হচ্ছেন নাকি ?

—না একথা জিজ্ঞেস করছেন কেন ?

—স্কুল সম্পর্কে এত বেশ উৎসাহ দেখাচ্ছেন।

—এতদিন যাদের পড়ালাম, তাদের পরীক্ষার জন্য চিন্তা হবে না ?

—মেয়েদের পরীক্ষা পর্যন্ত আমি থাকব না। আমি এ মাসের শেষেই চাকরি ছেড়ে দিচ্ছি।

—ছেড়ে দিচ্ছেন ?

জীবনলাল গরম জলে চা ফেলল। চামচে দিয়ে ঠকাঠক করতে করতে বলল, আমি চাকরিতে ঢুকেছি বারো বছর আগে, এই মাসের তিরিশ তারিখে বারো বছর পূর্ণ হবে। তারপর আমার ছুটি।

এই কথার পর অনেক প্রশ্ন মনে আসে। মাধ্বরী তবু আর কিছু জিজ্ঞেস করল না। মনে মনে সম্ভাব্য উত্তরগুলো ভাবতে লাগল, লোকটা কি বিয়ে করে শ্বশুরের সম্পত্তি পাচ্ছে ? লটারির ফার্স্ট

প্রাইজ পেয়েছে ? ঠিক বারো বছর বাদে চাকরি ছেড়ে দেবার মানে কি ? অন্য কোথাও ভাল চাকরি পেয়েছে ?

—আমি আর কোন জায়গায় চাকরি করব না। চাকরি আমার পোষায় না।

এক ধরনের মানুষ থাকে, যারা জীবনে উন্নতি চায় না, অবস্থার পরিবর্তন চায় না। কিংবা স্থায়িত্বের বদলে অনিশ্চয়তাতেই তারা আনন্দ পায় বেশি। জীবনলাল বোধহয় সেই ধরনের মানুষ, মাধ্বরী ভাবল।

খাটের তলা থেকে কাপ-ডিশ বার করে ধুয়ে নিয়ে মাধ্বরীর জন্য চা ঢাললো জীবনলাল, নিজের জন্য ভর্তি করল কাচের গেলাস। চায়ে চুমুক দিয়েই হেসে ফেললে মাধ্বরী। বলল, চিনি দিতে ভুলে গেছেন।

সেই কথা শুনে এমন ব্যস্ত হয়ে গেল জীবনলাল যে চিনির পাত্রটা মাধ্বরীর দিকে এগিয়ে দিতে গিয়ে সে নিজের গেলাসটা উল্টে ফেলল। ঘর-ময় চায়ে ছড়াছড়ি—শাড়ি বাঁচাবার জন্য মাধ্বরীকে উঠে দাঁড়াতে হল।

জীবনলাল অপ্রস্তুত ভাবে চুপ করে বসে রইল দু'এক মুহূর্ত। তার পর মুখ তুলে দুঃখী মানুষের মতন গলায় বলল, আমার সব কিছুই গোলমাল হয়ে যায়। আমি কোন কিছুই ঠিকঠাক করতে পারলাম না জীবনে। অপয়া তো ?

মাধ্বরী বলল, একটা কিছু দিয়ে চা-টা মুছে ফেলুন। নইলে জিনিসপত্র নষ্ট হয়ে যাবে। কিংবা আমাকে দিন—

—আপনি বুঝতে পারছেন না আমি অপয়া ? আমার জীবনে কিছুই হবে না।

—তাড়াতাড়ি মুছে ফেলুন আগে।

একটা নতুন তোয়ালেকে ন্যাতা বানিয়ে ফেলে মেঝেটা মুছে ফেলল জীবনলাল। মাধ্বরীর শাড়িতে একটু চা লেগে গেছে, সেই

দিকে তাকাল কয়েকবার।

মাধুরী বলল, ঠিক আছে, ওতে কিছু হবে না।

কেটলিতে আর একটু চা ছিল, সেটা নিজের গ্লাসে ঢেলে চুমুক দিতে দিতে জীবনলাল বলল, আমি কলকাতা ছেড়ে চলে যাচ্ছি। এখানে পোষায় না।

—কোথায়?

—সে জায়গাটা আপনি চিনবেন না।

—সেই জন্যই এই সব জিনিসপত্তর কিনেছেন?

—হ্যাঁ। সেখানে কিছুই পাওয়া যায় না।

মাধুরী হেসে বলল, কিন্তু এসব কি জিনিসপত্তর কেনার ছিরি? ঐ যে বঁটিটা কিনেছেন, ওটা তো একদম কাঁচা লোহা দু'দিনেই ভোঁতা হয়ে যাবে।

জীবনলালও এবার হেসে ফেলল। মাধুরী জীবনলালকে এর আগে কখনো হাসতে দেখেনি। তার এই হাসিটা খুবই অকপট। বঁটিটা কাছে টেনে ধরে পরীক্ষা করতে করতে বলল, তাই বুঝি? বললাম না, আমার কোন কিছুই ঠিকঠাক হয় না। যাকগে, কিছু দিন তো চলবে। আচ্ছা, এই বাসনপত্তরগুলো কি রকম?

—স্টেনলেস স্টীলেও ভেজাল হয়।

—এগুলো ভ্যাজাল?

—তা আমি ঠিক বলতে পারছি না। বিশ্বাসী দোকান থেকে না কিনলে—

—আমি তো কোন দোকানই চিনি না। যাই হোক, একটা জীবন কোন রকমে চলে যাবে।

মাধুরী হাতের কাপ-ডিশ নামিয়ে রেখে বলল, আচ্ছা, আমি তা হলে চলি।

জীবনলাল সে কথাটা গ্রাহ্য করল না। আপনমনেই বলল, বছর পাঁচেক আগে আমি একবার কলকাতার পাট চুকিয়ে চলে যেতে

চেয়েছিলাম। তখন হঠাৎ একদিন আমার বারো হাজার টাকা চুরি হয়ে গেল। প্রায় আমার সারা জীবনের জমানো টাকা। ভেবেছিলাম আর কখনো পারব না। তবু দাঁতে দাঁত চেপে, মাস্টারী আর, তিন-চারটে প্রাইভেট টিউশানি করে এই ক'বছরে আবার কিছু টাকা জমিয়েছি। এবার আমার শেষ চেষ্টা।

এত কথাও একসঙ্গে জীবনলাল কখনো বলে না। আজ যেন তাকে কথায় পেয়ে বসেছে।

—আপনি তাহলে আর স্কুলে যাচ্ছেন না?

—একদিন যাব। গিয়েই বা কি হবে? কেউ আমাকে পছন্দ করে না, আমি জানি। আমার গালে বসন্তর দাগ, আমি অপয়া।

তারপর জীবনলাল মাধুরীর দিকে ফিরে কড়া গলায় অভিযোগ করে বলল, আপনিও স্কুলে আমার সঙ্গে কোনদিন কথা বলেন নি।

মাধুরী একটু লজ্জা পেয়ে গেল। ইদানীং বাড়ি ফেরার সময় ট্রামে জীবনলালের সঙ্গে প্রায়ই দেখা হয়েছে, দু'একদিন ওরা রাস্তা দিয়ে একসঙ্গেও হেঁটেছে—কিন্তু স্কুলে থাকার সময়টুকু মাধুরী জীবনলালের সঙ্গে কখনো কথা বলেনি। না-চেনার ভাণ করেছে। আর কোন কারণে না—অন্য শিক্ষয়িত্রীরা কেউ বলে না বলেই মাধুরী নিয়ম ভাঙতে পারে নি।

জীবনলাল নীরস ভাবে বললো, থাক, আপনার লজ্জা পাবার কোনো কারণ নেই। আমি জানি, এইটাই আমার নিয়তি।

—আপনি বুঝি নিয়তি জানেন?

—না জেনে উপায় কি? অনেক চেষ্টা করেও আমি পৃথিবীর কারুর সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারলাম না। তাই এবার আমি সব কিছু ছেড়ে দিয়ে চলে যাচ্ছি।

—কোথায় যাচ্ছেন? পৃথিবীর বাইরে।

—প্রায় সেই রকমই।

—আপনি এমন কোন্ জায়গায় চলে যাচ্ছেন, যেখানকার নাম শুনলেও আমি চিনতে পারব না?

—তার কারণ, সেই জায়গাটার কোন নামই নেই।

—তার মানে?

জীবনলাল বইপত্রের গাদা থেকে একটা লম্বা কাগজ বার করল। ভাঁজ খোলার পর দেখা গেল একটা জেলা-ম্যাপ, ২৪ পরগণা জেলা। বিছানার ওপর ম্যাপটা ছড়িয়ে বলল, এই যে, দেখুন! এইটা ডায়মন্ড হারবার, এই যে কাকদ্বীপ, ফ্রেজারগঞ্জ—এখানে বকখালি—আর এই কয়েকটা ফোঁটা ফোঁটা মতন দেখছেন—এইগুলোর সরকারী ভাবে কোন নাম আছে কিনা জানি না—সম্ভবত নেই। স্থানীয় লোক নানান্ নামে ডাকে। আমি যে দ্বীপটার কথা বলছি, এই যে এইটা, লোকে বলে এটার নাম তারা দ্বীপ। এই ম্যাপে কিছুই বোঝা যায় না—আমার নিজের আঁকা আর একটা ম্যাপ আছে। দেখাচ্ছি।

জীবনলাল আর একটি ম্যাপ বার করল—এটি হাতে আঁকা হলেও বেশ সুচারু। জীবনলালের এ বিষয়ে দক্ষতা আছে বোঝা যায়। সেই ম্যাপটি খুলে বলল, এবার দেখুন, এই দ্বীপটার আকৃতি অনেকটা তারার মতন। স্থানীয় জেলে-মাঝিদের বিশ্বাস, আকাশের একটা তারা খসে পড়ে এই দ্বীপ হয়েছে। আসলে এটা চর জেগে ওঠা জমি। দ্বীপটার বয়েস প্রায় পঞ্চাশ বছর। আর ডুবে যাবার ভয় নেই। এই যে, এইখানে আমার বাড়ি।

মাধুরী বিস্মিত ভাবে বলল, আপনি ঐ দ্বীপে গিয়ে থাকবেন? একা একা?

জীবনলাল বলল, একা একা থাকতে পারলে ভাল হত। দুঃখের বিষয়, তা সম্ভব নয়। মানুষ সব জায়গাতেই আছে। দ্বীপটা নেহাত ছোট নয়, এতে বেশ খানিকটা জায়গায় চাষ-বাস হয়, কিছু ঘর-বাড়িও আছে। আমি হিসেব নিয়ে দেখেছি, প্রায় পৌনে দু'শো লোকের বাস ঐ দ্বীপে।

—আপনি ওখানে গেছেন আগে?

—আপনি কি ভাবছেন, আমি ঘরে বসে বসে এর স্বপ্ন দেখেছি? আজ থেকে আট বছর আগে, আমি ঐ দ্বীপে এক বিঘে জমি কিনেছি। সেটেলমেন্ট অফিসকে রীতিমতন টাকা দিয়ে দলিল করাতে হয়েছে। তখন অবশ্য দাম খুবই সস্তা ছিল—এখন বাড়লেও বাড়তে পারে। দ্বীপটার প্রধান অসুবিধে স্থলভাগের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা খুব মুশকিল। ডিঙিনৌকো ছাড়া আর কিছু ব্যবস্থা নেই। তাতে আমার কোন অসুবিধে হবে না—কারণ আমি যোগাযোগ রাখতে চাই না।

—কিন্তু আপনি ঐ দ্বীপে গিয়ে থাকবেন কেন? ওখানে কি গুপ্তধন আছে?

—ওখানে কি আছে, আমি তা জানি না। ওখানে কি নেই, সেটা জানি। ওখানে সভ্যজগতের মানুষ নেই।

—কিন্তু এই সমস্ত দ্বীপ গুহা ছেড়ে মানুষ তো সভ্যজগতেই আসতে চায়। সেইটাই স্বাভাবিক নয় কি?

সবার জন্য নয়। এই সভ্যতার নিয়ম-কানুন সবাইকে শান্তি দিতে পারে না। আমাকে দিতে পারে নি। আপনাকেই বা কি দিয়েছে?

—আমাকে? কেন, আমি তো বেশ ভাল আছি।

—ভাল আছেন? কিন্তু আপনাকে মনে হয়, আপনি খুব একা।

—না। একা কেন হব?

—তাহলে তো ভালই। আমি সারাজীবন শুধু হেরে গেছি। খুব কম বয়েসে আমার বাবা-মা মারা যায়। মামার সংসারে মানুষ। চিরকাল শুধু লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য করেছি। এম.এস.সি পরীক্ষার ঠিক আগে স্মলপক্সে মরতে বসেছিলাম। শেষ পর্যন্ত মরলাম না, কিন্তু পরীক্ষাটাও দেওয়া হয় নি। আর দেওয়াও হল না। এ পর্যন্ত পাঁচটা চাকরি করেছি, কোথাও টিঁকতে পারিনি। সত্যিই

আমি অপয়া—সব জায়গাতেই আমার জন্য একটা না একটা গণ্ডগোল হয়। লোকে আমাকে সহ্য করতে পারে না।

—এটা আপনি কি বলছেন, এটা আপনার কুসংস্কার।

—কুসংস্কার! আমার জীবনের ব্যর্থতার লিস্ট গুনে যদি সব আপনাকে শোনাতাম, তাহলে আপনি বুঝতে পারতেন। একজন মানুষের জীবনে এতগুলো ব্যর্থতা আসে কি করে? শেষ পর্যন্ত এসে কোথায় ঠেকেছি, একটা মেয়ে-স্কুলের টিচার সবাই দেখলেই মুখ ফেরায়, কেউ পছন্দ করে না। একটা নিকৃষ্ট অবহেলিত জীব।

মাধুরী একটুক্ষণ চুপ করে বসে রইল। তারপর জীবনলালের মুখের দিকে তার শান্ত চোখ দুটি মেলে বলল, কিন্তু হেরে যাবার তো কোন মানে হয় না। এসব ব্যর্থতা কাটিয়ে মানুষ আবার উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করে। মানুষই তো তা পারে।

—আমি তো হেরে যাই নি।

—আপনি এসব ছেড়ে পালিয়ে যেতে চাইছেন।

—না। মানুষ যখন তীর্থে যায়, সেটা কি পালিয়ে যাওয়া? মানুষ যখন এক দেশ ছেড়ে আর এক দেশে যায়—সেটাও কি পালিয়ে যাওয়া? আমি যখন থেকে বুঝলাম, এই সভ্যসমাজ আমার জন্য নয়, তখন থেকেই আমি একটা বিদেশ খুঁজছিলাম। যেখানে আমি শুধু নিজের ওপর নির্ভর করে থাকতে পারব—। ঐ দ্বীপটা আমি খুঁজে পেয়েছি। বছরে একবার করে ওখানে যাই! একটা ছোট্ট কুঁড়েঘর বানিয়েছি। এবার আমি পাকাপাকি ভাবে চলে যাবার জন্য তৈরি হতে পেরেছি। নিজের খাবার নিজে রান্না করে খাব। বাড়ির সামনে বাগান করব তাই অনেক রকম ফুল আর তরি-তরকারির বীজ কিনেছি। যদি বাগান নষ্ট হয়ে যায়, কেউ আমাকে দোষ দিতে আসবে না! দ্বীপে যে-সব লোকজন থাকে—তাদের ছেলে-মেয়েদের নিজের বাড়িতে বসে পড়াব—অর্থাৎ যদি তারা আমার কাছে পড়তে চায় পড়বে—না চায় পড়বে না—আমার কিছু যায়-আসে না।

—আপনার জীবনে আর কিছু চাইবার নেই?

—কিছু না।

—শুনতে কিন্তু বেশ ভালই লাগছে। জানি না, এই ভাবে কোন মানুষ থাকতে পারে কি না। পারলে বোধহয় ভালোই হত।

—আমি বছরের পর বছর ধরে এই স্বপ্ন দেখছি। এক যুগ ধরে আমি কষ্ট সহ্য করেছি। এবার সব কিছুই বদলে যাবে। বাড়ি-ওয়ালাকে নোটিস দিয়ে দিয়েছি, স্কুলে পদত্যাগ পত্র পাঠাব—কোথাও কারুর কাছে কোন ঋণ রাখিনি—আর কোনদিন আমি পিচ-বাঁধানো রাস্তা দিয়ে হাঁটব না।

—মানুষ সন্ন্যাসী হয়ে চলে যায়, এটাও বুঝি সেই রকম?

—তাও বলতে পারেন। তবে, আমি কোন ঈশ্বরের টানে যাচ্ছি না—এখানে আমার স্থান হল না, তাই চলে যাচ্ছি।

—আপনি যে দ্বীপের কথা বলছেন, সেটা কি একেবারে সমুদ্রের মধ্যে?

—ঠিক সমুদ্র নয়। ব্যাক ওয়াটার, খাঁড়ি যাকে বলে। তবে সমুদ্রের মতনই মনে হয়।

—আপনার একঘেয়ে লাগবে না?

—মানুষের সঙ্গও তো অনেক সময় একঘেয়ে লাগে। আমি ওখানে কয়েকদিন থেকে দেখেছি। ওখানে সব কিছুই মস্ত বড়—আকাশটা ওখানে বিশাল, যতদূর চোখ যায় জল—সূর্যের তাপ গনগনে—এক এক সময় হাওয়ায় মনে হয় উড়িয়ে নিয়ে যাবে। খারাপ লাগুক কিংবা ভাল লাগুক, নির্জনতাই আমার একমাত্র আশ্রয়।

হঠাৎ মাধুরীর বুক থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। বেলা পড়ে এসেছে, বাইরে একটু একটু আলো থাকলেও ঘরের মধ্যে জীবন-লাল এখনো আলো জ্বালে নি। জীবনলালের চোখ-মুখ ভালো করে দেখা যায় না। তাকে মনে হয় যেন একটা ঘোর-লাগা মানুষ। আর যাই হোক, করবীর স্বামী অরূপের মতন মানুষের চেয়ে জীবনলাল

অনেক বেশী খাঁটি। তার একটা কিছু স্বপ্ন আছে।

জীবনলালের আবছা চেহারার দিকে তাকিয়ে মাধুরী বলল, আপনি যা বললেন, এটা অনেকটা স্বপ্নের মতন। অনেক মানুষেরই মনের মধ্যে এরকম একটা ইচ্ছে হয়তো থাকে, কিন্তু সত্যি সত্যি কখনো যাওয়া হয় না। আপনি সত্যি সত্যি যাচ্ছেন, এটা ঠিক বিশ্বাস করতে পারছি না এখনো।

জীবনলাল বলল, আমি প্রত্যেকদিন তিল তিল করে নিজেকে এই জন্য প্রস্তুত করেছি। পাছে ওখানে কথা বলার মতন মানুষজনের অভাবে আমার কষ্ট হয়—তাই এখানেও আমি মানুষ-জনের সঙ্গে মেশা বন্ধ করে দিলাম। অনেকদিন বাদে শুধু আপনার সঙ্গেই এত কথা বললাম। হয়তো আপনি বিরক্ত হচ্ছিলেন, ভদ্রতা করে শুনছিলেন—

—না, তা নয়!

—আপনি কেন এসেছেন?

—আমি? এমনিই, মানে হঠাৎ মনে হল—তা এসে তো ভালই হয়েছে। আপনার কথা জানতে পারলাম।

—আমি তো আপনার কথা বিশেষ কিছু জানি না।

—জানবার মত বিশেষ কিছু নেই! আপনার মতন এ-রকম দুঃসাহসী কোন পরিকল্পনাও আমার নেই।

—জীবনটা যে-রকম চলছে, সে রকমই চলবে?

—অধিকাংশ মানুষের জীবনই তো সেরকম ভাবে কেটে যায়।

—আপনার সম্পর্কে আমি এইটুকু শুধু বুঝি, আপনার কেউ নেই।

—আপনার বয়েসী স্ত্রীলোকের সাধারণত যা থাকে, স্বামী, পুত্র—

—আমার স্বামীও ছিল, একটি ছেলেও—তারা আমাকে ছেড়ে চলে গেছে।

—আর এখন?

মাধুরী চুপ করে রইল। জীবনলাল উঠে এসে আলো জ্বালাল। তারপর সোজাসুজি জিজ্ঞেস করল, আপনি যাবেন আমার সঙ্গে?

মাধুরী চমকে উঠলো না, ভয়ও পেল না। জীবনলালকে এই ক'দিন দেখেই বুঝেছে, লোকটিকে ভয় পাবার কোনো কারণ নেই। তাই সে একা একা এখানে আসতে পারে। জীবনলাল অন্যদের সঙ্গে সহজে কথা বলে না—কিন্তু যখন সে কথা বলে, তখন তার বক্তব্য খুব স্পষ্ট।

মাধুরী চোখ তুলে বলল কোথায়?

—আমার সঙ্গে ঐ দ্বীপে?

—তা কি হয়?

—কেন হবে না? এই রুটিন-বাঁধা জীবন কাটিয়ে যাবেন?

—এটা আপনি কি বলছেন, এটা আপনি ঠিক ভেবে বলছেন না!

—কেন?

—এরকম ভাবে কারুকে সঙ্গে ডাকা যায় না।

—যায় না বুঝি? আমি কোনো নিয়ম জানি না।

—নিয়মের কথা নয়। আপনি আর আমি দু'জনে আলাদা ধরনের মানুষ—আমাদের সমস্যা এক নয়। তাছাড়া আমি মেয়ে। একটি মেয়ে কি একজন পুরুষের সঙ্গে এমনি হঠাৎ যেতে পারে?

জীবনলাল মুখ ফিরিয়ে নিল। তার চোখ বুজে গেল। বিড়-বিড় করতে লাগল, আমারই ভুল। আমার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। এ-রকম ভুল আমি কখনো করি নি।

তারপর মুখ ফিরিয়ে কঠোর ভাবে বলল, আমি আর সাত-আটদিন মাত্র আছি। আপনি দয়া করে আমার এখানে আর আসবেন না।

মাধুরী রেগে গেল না, অপমানিতও বোধ করল না। একটু হেসে বলল, আপনি চলেই তো যাচ্ছেন, এখন রাগারাগি করা কি উচিত? আমি তো আপনার কোন ক্ষতি করি নি।

—আপনি আমাকে দয়া দেখাতে এসেছেন?

—ও ভাবে ভাবছেন কেন? মানুষ কি মানুষের কাছে আসে না? এমনিই কথা বলে না?

—সারা জীবনে কোন মেয়ে আমার সঙ্গে মেশেনি। মেয়েদের আমার দরকারও নেই। আপনি শুধু শুধু এসে কেন আমার সব গোলমাল করে দিতে চাইছেন?

—কিছু তো গোলমাল করি নি। আপনার তো সব পরিকল্পনা ঠিকই হয়েছিল। আমি হঠাৎ আজ এসে না পড়লে কিছু জানতেও পারতাম না।

—আমি জিনিসপত্তরগুলো খারাপ কিনেছি—এগুলো কোন মেয়ের মুখ থেকে শুনতে চাই নি। ওগুলো শুধু আমি একা ব্যবহার করব—ভাল হোক, খারাপ হোক, কিছু যায়-আসে না।

—সব পুরুষমানুষই আসলে খুব ছেলেমানুষ হঠাৎ হঠাৎ তাদের ছেলেমানুষী বেরিয়ে পড়ে। এই সামান্য ব্যাপারে আপনি রেগে গেলেন? আপনি যে-ভাবে চলে যাচ্ছেন, এ-ভাবে সবাই যেতে পারে না। আমি আপনাকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

—আমি এই সভ্যতা ছেড়ে চলে যাচ্ছি। সুতরাং এই সব মৌখিক ভদ্রতায় আমার কোন দরকার নেই।

মাধুরীর থেকে অল্প দূরে দাঁড়িয়ে আছে জীবনলাল। মুখখানা অন্যদিকে ফেরানো। বাইরে রাস্তার শব্দ, অস্পষ্ট শোনা গেলেও এই ঘরের মধ্যে সম্পূর্ণ নিস্তব্ধতা। এত কাছাকাছি বসে থেকেও দুটি আত্মা পরস্পরের থেকে বহু দূরে। মাধুরীর বুকের মধ্যটা মুচড়ে উঠলো। তার কষ্ট হলো, হঠাৎ খুব কষ্ট হলো, জীবনলালের জন্য নয়। নিজের কথা ভেবে।

হাত-ব্যাগটা কুড়িয়ে নিয়ে মাধুরী উঠে দাঁড়াল। মুখের হাসিটা তখনও অক্ষুণ্ণ রেখেছে। সারা ঘরের দিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে মাধুরী বলল, ঠিক আছে, চলি তা হলে। স্কুলে তো একদিন আসবেনই—সেদিন দেখা হবে।

ঘর থেকে মাধুরী নেমে এল ছাদে। জীবনলাল দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে রইল। সিঁড়িটা অন্ধকার, আলো জ্বালা হয় নি। আগের দিন জীবনলাল তাকে একতলা পর্যন্ত পেঁাছে দিয়েছিল—আজ আর সে এল না।

রাস্তায় বেরিয়ে এসে মাধুরী ট্রাম-স্টপে দাঁড়াল। একবার মুখ ফিরিয়ে দেখল জীবনলালের বাড়ির ছাদের দিকে। ছাদের কার্নিসে থুতনি ঠেকিয়ে জীবনলাল চেয়ে আছে একদৃষ্টে। অদ্ভুত অভিমানী সেই দৃষ্টি। মাধুরীর বুকের মধ্যে আবার মুচড়ে উঠল। মানুষটা দুঃখী—সকলের বিরুদ্ধে একটা অভিমান নিয়ে চলে যাচ্ছে লোকালয় ছেড়ে। সেখানে গিয়েও কি শান্তি পাবে?

বাড়ি ফিরে আসার পরও মাধুরীর সেই মন খারাপ ভাবটা রয়ে গেল। একজন কারুর দুঃখের কথা শুনলে তার ছোঁয়াচ লেগে যায়। বাথরুমে গিয়ে অনেকক্ষণ ধরে গা ধুয়ে মাধুরী একটু অন্যমনস্ক হবার চেষ্টা করল। তারপর রেডিও চালিয়ে দিয়ে একটা বই হাতে নিয়ে বসল জানালার ধারে।

সন্ধ্যেগুলো আর কাটতেই চায় না। আজকাল মাধুরী দেরী করে ফিরলেও বলার কেউ নেই। গগনেন্দ্রনাথ বিকেলবেলাই চলে যান আশ্রমে—ফেরেন সেই প্রায় রাত দশটায়। প্রিয়ব্রতও প্রায়ই বাড়িতে থাকে না। ইলেকশানের পর সে এখন আবার থিয়েটার নিয়ে মেতেছে। ঐ বয়সের ছেলে সন্ধ্যেবেলা বাড়িতে বসে থাকবেই বা কেন? বেশ দেরী করেই ফেরে প্রিয়ব্রত—তারপর অনেক রাত জেগে পড়ে।

সারা সন্ধ্যেবেলা বাড়িটা ফাঁকা। সুশীলার মা রান্না-বান্না সেরে একটু সময় পেলেই ঘুমিয়ে পড়ে। শ্বাশুড়ি যতদিন বেঁচে ছিলেন, ততদিন তবু বাড়িটাকে এত ফাঁকা মনে হত না। একলা একলা বই পড়ে আর রেডিও শুনে শুনে এক এক সময় মাধুরীর বিরক্তি ধরে যায়। তখন ইচ্ছে করে বইটা ছুঁড়ে ফেলে দিতে কিংবা রেডিওটা

আছড়ে ভেঙে ফেলতে। মাধুরী সে-সব কিছুই করে না। সে জানে এই ভাবেই তাকে বাকি জীবনটা কাটাতে হবে।

বই রেখে বিছানায় শুয়ে পড়ল মাধুরী। আলো নিভিয়ে দিল। জীবনলালের কথাই মনে পড়তে লাগল বার বার। আশ্চর্য, একজন মুখচোরা স্কুলমাস্টার, সে মনে মনে এতদিন ধরে এই এটা স্বপ্ন লালন করেছে—একটা দ্বীপে গিয়ে জীবনটা কাটিয়ে দেবে। বাইরে থেকে ওকে দেখে কেউ এটা ভাবতেই পারবে না। এরকম কত মানুষ আছে, বাইরে থেকে দেখে যাদের কিছুই বোঝা যায় না। শেষকালে জীবনলাল হঠাৎ ঐ কথাটা বলল কেন? কোনদিন তো ওর এরকম কোন দুর্বলতা দেখা যায় নি?

একটু একটু লজ্জায় মাধুরীর কান গরম হয়ে গেল। কেউ তাকে এরকম ভাবে আহ্বান জানায় নি। সব কিছু ছেড়ে···একটা দ্বীপে। জীবনলাল দুঃখে পেয়েছে—কিন্তু মাধুরীর তো অন্য কোন উপায় ছিল না।

নানা কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছিল মাধুরী। দরজা খোলার শব্দে আচমকা ঘুম ভাঙল, ঘর অন্ধকার, দরজার এক পাল্লা খোলা, সেখানে দাঁড়িয়ে আছে একজন দীর্ঘকায় পুরুষ। মাধুরী সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসল। অন্ধকারে চোখ সইয়ে নিয়ে মাধুরী তাকাল ভাল করে।

সেই মূর্তি গম্ভীরভাবে ডাকল, মাধুরী!

মাধুরী আমূল ভাবে চমকে উঠল, শরীর কেঁপে উঠল তার। একেবারে ভেতর থেকে শব্দ বার করে জিজ্ঞেস করল, কে?

—মাধুরী, আমি ফিরে এসেছি।

—কে?

—আমি!

—কে?

—আমি!

—কে?

—চিনতে পারছ না? আমার বড্ড দেরী হয়ে গেল!

মাধুরী পায়ে পায়ে এগিয়ে এল দরজার কাছে। সন্দেহ কি, দেবব্রতই ফিরে এসেছে। সুট-টাই পরা, কপালের ওপর কয়েকটা চুল এসে পড়েছে—কোন পরিবর্তন নেই—ঠিক যেন সে বম্বে থেকে ফিরে এসেছে, যেমন আসার কথা ছিল সেই সন্ধ্যেবেলা। যেন এটা কলকাতা নয়, হায়দ্রাবাদ—যেন মাঝখানে সাড়ে ন'বছর কেটে যায় নি—সবটাই একটা দুঃস্বপ্ন—এই রকম ভাবেই দেবব্রত হঠাৎ হঠাৎ এসে ঘুমন্ত মাধুরীকে চমকে দিত।

কিন্তু দুঃস্বপ্ন তো নয়। মাঝখানের এই সাড়ে ন'বছর যে কী ভয়ঙ্কর দীর্ঘ তা মাধুরী ছাড়া আর কেউ বুঝবে না।

মাধুরী তীক্ষ্ম গলায় বলল, তুমি কেন এসেছ?

—আমায় ক্ষমা কর!

—তুমি মরে গেছ! তুমি নেই।

—মাধুরী আমি ফিরে এসেছি।

—কেন এসেছ?

—মাধুরী···

—আমি চাই না, আমি তোমাকে আর দেখতে চাই না। তুমি নেই! তুমি আর কোথাও নেই!

—আমি পরে সব বলব। আমি ভীষণ ক্লান্ত—আমাকে একটু আশ্রয় দাও!

মাধুরী পাগলের মতন হয়ে গেল। দু'দিকে মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলল, না, না, তুমি নেই, তুমি নেই! আমি তোমাকে চাই না—তুমি মিথ্যে!

দীর্ঘকায় মূর্তি হাত বাড়িয়ে দরজার পাশে সুইচ টিপে আলো জ্বালাল। তারপর হেসে উঠল হা-হা করে। দেবব্রত নয়, প্রিয়ব্রত।

মাধুরী তখনও যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। স্থিরদৃষ্টিতে

প্রিয়ব্রতর দিকে তাকিয়ে রইল। অস্ফুট গলায় উচ্চারণ করল, একি!

প্রিয়ব্রত হাসতে হাসতে বলল, কি, ঠিক হয় নি? একদম বুঝতে পারনি—আজ আমাদের ড্রেস রিহার্সাল ছিল—আমার রোলটা—

মাধুরীর চোখে যেন আগুন জ্বলছে। এগিয়ে এসে খুব জোরে একটা চড় মারল প্রিয়ব্রতর গালে। তারপর পেছন ফিরে ছুটে বিছানার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কাঁদতে লাগল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

প্রিয়ব্রত ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল। এতটা সে ভাবতে পারে নি। মানুষকে ভূতের ভয় দেখাতে গেলে অনেক সময় উল্টো ফল হয়, কিন্তু মাধুরীর তো ভূতেরও ভয় নেই।

প্রিয়ব্রত মাধুরীর পিঠে হাত দিয়ে বলল, বৌদি, একি করছ! এত সীরিয়াসলি নিচ্ছ কেন? আমি একটু ঠাট্টা করে···

মাধুরীর কান্না তবু থামে না। মাধুরীকে এরকম ভাবে কাঁদতে প্রিয়ব্রত কখনো দেখেনি। ওর মনে একটা বড় রকমের ধাক্কা লেগেছে। প্রিয়ব্রত অনেক কথা বলেও কান্না থামাতে পারল না। তখন সে জোর করে মাধুরীকে বিছানা থেকে তুলে আনল।

মাধুরীর সমস্ত মুখখানা চোখের জলে ভেজা। অদ্ভুত সুন্দর আর করুণ সেই মুখ। নিজের ছেলেমানুষী রসিকতার জন্য অনুশোচনায় ছোট হয়ে গেল প্রিয়ব্রত।

॥ ১২ ॥

নবারুণ বলল, মাইরি বৃষ্টি এসে সব মার্ডার করে দিল। আকাশের যা অবস্থা, সারাদিনই এরকম চলবে মনে হচ্ছে।

সঞ্জয় বলল, তাস এনেছিস তো?

—ধ্যাৎ, পিকনিকে এসে তাস খেলে সময় কাটাবার কোন মানে হয়?

—তা হলে গান-বাজনা হবে।

এত বৃষ্টি যে গাড়ি থেকে জিনিষপত্র নামাতে নামাতেই সবাই

ভিজে গেল। কেউ ছাতা আনেনি, আনার কথা কারুর মনেও আসে নি।

বাড়িটা শ্রীরামপুরের কাছে। খুব বড় বাড়ি নয়, দোতলায় মাত্র একখানি ঘর—একতলায় লম্বা হল-ঘর, বারান্দা, খাবার জায়গা। কিন্তু চৌহদ্দিটা মস্ত বড়, অনেকখানি জায়গা জুড়ে বাগান, পুকুর। কাছাকাছি কোন বসতি নেই, অদূরেই গঙ্গা।

ওরা এসেছে বারো জন, তার মধ্যে চারটি মেয়ে! রুচিরা, ঝর্ণা ছাড়াও বাসন্তী আর অরুণা। বাড়িটা নবারুণের মেসোমশাইয়ের। এই শরতেও বর্ষাকালের মতন বৃষ্টি এসে অনেকখানি মেজাজ নষ্ট করে দিল। বাড়ির কেয়ার-টেকারই রান্না করে দিতে পারে কিন্তু ছেলেরা-মেয়েরা মিলেই রাঁধবে—ওতে ভাল সময় কাটানো যায়।

কয়েকজন ছেলে গেল মেয়েদের সঙ্গে রান্নাবান্নার দিকে, কয়েকটি ছেলে দোতলার ঘরে তাস নিয়ে বসে গেল। প্রিয়ব্রত তাস খেলতেও জানে না, রান্নাও জীবনে কখনো করেনি, আগ্রহও নেই। সুতরাং তার কাজ হল একবার ওপরে একবার নিচে ঘোরাঘুরি করা আর বিজ্ঞের মতন সব কিছুতেই মন্তব্য করা।

সুভদ্র তাসও বেশ ভাল খেলে। এক একজন মানুষ অনেক গুণ নিয়ে জন্মায়—সুভদ্রও সেই রকম। যে-কোন জমায়েতেই সে প্রধান আকর্ষণ, গান তো খুবই ভাল গায়। সুভদ্রকে হিংসে না করে উপায় নেই প্রিয়ব্রতর। অথচ সুভদ্র কক্ষনো প্রিয়ব্রতর প্রতি সেরকম ভাব দেখায় না—প্রতিটি প্রতিযোগিতায় প্রিয়ব্রতকে হারিয়ে দিয়েও সে ব্যবহার করে ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মতন। তাতেই আরও গা জ্বলে যায়।

সুভদ্র প্রিয়ব্রতকে ডেকে বলল, তুমি ব্রীজ জান না? আমার পাশে এসে বস না—শিখিয়ে দিচ্ছি, বেশীক্ষণ লাগবে না শিখতে!

প্রিয়ব্রত ঠোঁট উল্টে বলল, আমার ভাল লাগে না। ইন্টারেস্ট নেই।

—তুমি তাহলে আমাদের স্কোর লেখো।

—আহা-হা, তোমরা নিজেরা খেলবে, আর আমি বসে বসে স্কোর লিখব!

বৃষ্টি না পড়লে মাঠে, কোন দৌড়াদৌড়ির খেলায় প্রিয়ব্রত কৃতিত্ব দেখাতে পারত। কিংবা একটা দাবার সেট আনলে হত—তখন দেখা যেত সুভদ্র জানে কিনা। কিংবা জানলেও সে কি প্রিয়ব্রতকে হারাতে পারত?

নিচে রান্নার জায়গায় এসে দেখল মেয়েরা শাড়ি গাছকোমর করে বেঁধে মহা উৎসাহে লেগে গেছে। আর তিনজন ছেলে মেয়েদের সঙ্গে গা-ঘেঁষাঘেঁষি করার লোভে ওদের কথামতন আদা বাটছে, তরকারি কুটছে। সঞ্জয় আছে এই দলে।

ঝর্ণা এ বাড়িতে আগে অনেকবার এসেছে বলে সে জানে কোথায় কোন জিনিসপত্তর! রান্নাঘরে সেই-নেত্রী। রুচিরা খুব আলগোছে হালকা কাজ করছে শুধু। সব সময় সচেতন, সাজপোশাক যেন নষ্ট না হয়ে যায়। কাজের চেয়ে এই ঘরে হাসি-গল্পই বেশী।

রুচিরা আর ঝর্ণার মধ্যে দারুণ ভাব, সম্প্রতি ওরা পরস্পরকে তুই-তুকারি করতে শুরু করেছে। দেখে কেউ বুঝবে না, ব্যক্তিগত জীবনে ওরা পরস্পরের সাংঘাতিক শত্রু, প্রিয়ব্রত এ কথা জানে। ঘৃণা যদি কোন অস্ত্র হত—তাহলে ওরা পরস্পরকে কবেই খতম করে ফেলত। আশ্চর্য এই মেয়েরা, প্রিয়ব্রত ভাবল।

ঝর্ণা প্রিয়ব্রতকে দেখে বলল, এই, আপনি খালি ফাঁকি দিয়ে বেড়াচ্ছেন। পেঁয়াজগুলো কুচিয়ে দিন বরং!

প্রিয়ব্রত বলল, আমার দ্বারা ওসব হবে না। পেঁয়াজ কুচোতে গেলে আমার কান্না পায়।

—তাই কাঁদুন একটু বসে বসে। আমরা দেখি।

সবাই হেসে উঠল। প্রিয়ব্রত বলল, যা রাঁধবে তোমরা—দেখে মনে হচ্ছে, সেগুলো খেয়েই চোখের জল ফেলতে হবে।

—আ হা-হা-হা

প্রিয়ব্রত গম্ভীর ভাবে জানাল, আমার কাজ হচ্ছে সব রান্না আগে থেকে টেস্ট করে দেখা। আর মাঝে মাঝে দোতলায় ওদের জন্য চায়ের হুকুম করা। যেমন, এখন একবার চায়ের জল বসাও।

সবাই সমস্বরে বলল, হবে না, হবে না।

অবশ্য চা-হল। চা খেয়ে, খানিকটা আড্ডা দিয়ে প্রিয়ব্রত কেটে পড়ল সেখান থেকে। সবাই কাজ করছে, একজনের নিষ্কর্মা হয়ে বেশীক্ষণ বসে থাকা ভাল দেখায় না।

প্রিয়ব্রত বারান্দায় এসে বৃষ্টি দেখতে লাগল। আকাশের রং ঘোলাটে, মাঝে মাঝে মেঘ কেটে দেখা যায় অত্যুজ্জ্বল আলো—এরই মধ্য দিয়ে একটি এরোপ্লেন অসহায় ভাবে উড়ে যায়। পুকুরের জলে ফোঁটায় ফোঁটায় অসংখ্য ছোট ছোট বৃত্ত।

ওপর থেকে উঁকি মেরে নবারুণ বলল, কি রে প্রিয়ব্রত, তুই কি কবি হয়ে গেলি নাকি? খুব যে প্রকৃতি দেখছিস্!

প্রিয়ব্রত বললো, প্রকৃতি আবার কোথায়? এই তো একটা ছোট পুকুর আর একঘেয়ে বৃষ্টি।

নবারুণ বললো, আরে ইডিয়েট, ওকেই প্রকৃতি বলে। দেখতে জানলে এই দেখেই কত কবি কত হাই থটের কবিতা লিখে ফেলে!

দুপুরে ঘণ্টাখানেকের জন্য বৃষ্টি ধরে এলো। তারপর আবার পড়তে লাগল ঝির ঝির করে, একটানা মাঝখানের সময় টুকুতে ওরা স্নান সেরে নিল। পুকুরে খুব দাপাদাপি চলল খানিকক্ষণ। সাঁতারে প্রিয়ব্রত খুব দক্ষ, সে অনায়াসে এপার ওপার হয়ে যায়। কিন্তু প্রিয়ব্রত একটু দুঃখিত হল এই জন্য যে কেউ তাকে তারিফ করল না। কেউ যেন লক্ষ্যই করল না তাকে।

খাওয়া-দাওয়া সারতে প্রায় তিনটে বেজে গেল। এই সময়টা খুব জমে ছিল। প্রবল হাসাহাসি আর হুল্লোড়। মাংসটা এত ঝাল হয়েছে সবারই ঠোঁটে হুস হাস আওয়াজ। কারুর কারুর চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে গেল, তবু হাসির বিরাম নেই। যৌবনে সবই মানায়।

খাওয়া শেষ হবার পর সবাই এসে জমায়েত হল দোতলায়। এখান থেকে অনেকটা দূর পর্যন্ত দেখা যায়। বৃষ্টির ধারায় পৃথিবী নিঃসাড় হয়ে আছে।

নবারুণরা আবার তাস নিয়ে বসতে যাচ্ছিল, মেয়েরা তাদের সব তাস এলোমেলো করে দিল। তারা এখন আড্ডা মারবে। এতক্ষণ তারা রান্না নিয়ে ব্যস্ত ছিল, আর অন্যরা শুধু বসে বসে তাস খেলবে?

সঞ্জয় বলল, এই গল্পটা শুনেছ—স্বর্গে বিদ্যাসাগর মশাইয়ের কোলে মাথা দিয়ে মেরিলিন মনরো শুয়ে আছে?

ঝর্ণা বলল, এটা আবার কি গল্প?

সঞ্জয় উৎসাহ পেয়ে বলল, শোন না। স্বর্গের নন্দন কাননে বিদ্যাসাগর মশাই বসে আছেন, আর তাঁর কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে আছেন মেরিলিন মনরো। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী পাশ দিয়ে যেতে যেতে সেই দৃশ্য দেখে থমকে গেলেন। বিদ্যাসাগরের সঙ্গে চোখাচোখি হওয়ায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী একগাল হেসে বললেন, এটা বেশ ভালই হয়েছে। আপনি মাস্টারমশাই, পৃথিবীতে থাকতে অনেক দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেছেন, পরের জন্য জীবনটা ব্যয় করেছেন। স্বর্গে এসে তো আপনার কিছু পুরস্কার পাওয়া দরকার—ভালই পুরস্কার পেয়েছেন—এটা আপনার পুণ্যফল।

এই বলে হরপ্রসাদ মেরিলিন মনরোর দিকে ইঙ্গিত করলেন। বিদ্যাসাগরও সেই দিকে ইঙ্গিত করে হরপ্রসাদকে বললেন, আরে মুখ্যু, এটাও বুঝলি না? এটা কি আমার পুণ্যফল, না এর পাপের শাস্তি?

হাসি থামার পর সুভদ্র বলল, তা হলে তোমরা আইনস্টাইন আর লানা টার্নার-এর গল্পটা জানো? নিউ ইয়র্কের রাস্তায় একদিন···

গল্পের পর গল্প। হাসির তোড়ে ঘর সরগরম। প্রিয়ব্রতই বসে রইল চুপ করে। সে এরকম গল্প বলতে পারে না। বেশী লোকজনেরা থাকলে সে কিছু কথাবার্তা বলতে পারে না। তার যত

জারিজুরি নিজের বাড়িতে। বাইরে এসে সে অনাবশ্যক ভাবে লাজুক হয়ে পড়ে।

নবারুণ বলল, আমিও একটা ভাল গল্প জানি—মঙ্গলগ্রহে কি ভাবে রিপ্রোডাকশন হয়—কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, মেয়েরা রয়েছে।

ঝর্ণা ধমক দিয়ে বলল, এই দাদা, না, ওসব নয়!

—আমরা ছেলেরা এখন একটু প্রাণ খুলে কথা বলব—তোরা মেয়েরা এখন একটু অন্য জায়গায় যা না।

—তা চলবে না। গান হোক।

গানের কথা উঠলেই সুভদ্রর কথা আসে। কিন্তু সুভদ্র বলল, আগে মেয়েরা কেউ না গাইলে সে গাইবে না। ঝর্ণাও মন্দ গায় না। অরুণা বেশ ভাল গায়—যদিও তার লজ্জা বড্ড বেশী। মেয়েরা কয়েকখানা গান শোনাবার পর সুভদ্র শুরু করল রবীন্দ্রসঙ্গীত। স্বীকার না করে উপায় নেই যে সে চমৎকার সুর ও আবেগ নিয়ে গাইতে পারে—তবু প্রিয়ব্রতর ভাল লাগছিল না। এই পিকনিকের দলে তার যেন কোন জায়গা নেই—সবাই অন্যদের নিয়ে ব্যস্ত!

এক সময় প্রিয়ব্রত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সবার অলক্ষ্যে, নেমে এল নিচে। একটা সিগারেট ধরালো। বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সেখানে—সেখানে থেকেও শোনা যাচ্ছে সুভদ্রর গান—দূর থেকে শুনতে বরং বেশী ভাল লাগছে।

যখন রুচিরা এসে তার পাশে দাঁড়িয়েছে, প্রিয়ব্রত খেয়াল করেনি। রুচিরা জিজ্ঞেস করল, বৃষ্টিতে ভিজবেন?

প্রিয়ব্রত চমকে তাকাল। রুচিরা সিঁড়ির একধাপ নেমে বলল, বসে থেকে থেকে ভাল লাগছে না। বাগানে বেড়াতে ইচ্ছে করছে। আসবেন?

প্রিয়ব্রত বলল, মালির একটা ছাতা আছে দেখেছিলাম, সেটা জোগাড় করব?

—তার দরকার নেই। এখন তো টিপ টিপ করে পড়ছে।

ভিজতে আপনার আপত্তি আছে ?

প্রিয়ব্রত সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল। বাগানে পা দিয়ে বলল, ভিজতে আমার ভালই লাগে।

রুচিরা পরেছে একটা ছাই-ছাই রঙের সিল্কের শাড়ি। শাড়িটা একটু উঁচু করে তুলে ভিজে ঘাসের মধ্যে ছপছপিয়ে সে হাঁটতে লাগল নিঃশব্দে। এমনিতে সে প্রসাধন ও সাজ-পোশাক সম্পর্কে খুব সজাগ, তবু হঠাৎ বৃষ্টি ভিজে এসব নষ্ট করার ইচ্ছে তার কেন হল কে জানে। আচমকা প্রিয়ব্রতর একটু ছেলেমানুষী গর্ব হল। এতক্ষণ সে এই দলের মধ্যে নিজেকে পরিত্যক্ত মনে করছিল, কিন্তু এখন দলের মধ্যে সবচেয়ে রূপসী ও গরবিনী মেয়েটি স্বেচ্ছায় তার সঙ্গে বেড়াতে এসেছে। সুভদ্রর গানের আসর ছেড়ে।

প্রিয়ব্রত বলল, আপনার শাড়ির রংটা কিন্তু আকাশের রঙের সঙ্গে বেশ মানিয়ে গেছে।

রুচিরা হাসিমুখখানা ফেরাল প্রিয়ব্রতর দিকে। বলল, এরকম বলতে হয়, তাই না ? আপনার উন্নতি হচ্ছে।

প্রিয়ব্রত অপ্রস্তুত হয়ে বলল কেন ?

—আস্তে আস্তে শিখছেন, মেয়েদের খুশি করার কথা কি ভাবে বলতে হয়।

—না, শেখার আর চান্স পাচ্ছি কোথায় ? মেয়েরা আমাকে পাত্তাই দেয় না।

—এটাও একটা ঐ ধরনের কথা। মেয়েরা পাত্তা দিচ্ছে না শুনলে মেয়েদের একটু দয়া হয়।

—আপনিও কি আমাকে আজ দয়া করতে এসেছেন নাকি ?

—এর মধ্যে দয়ার তো কিছু নেই। আমার বাগানে বেড়াতে ইচ্ছে হল, তাই এলাম। আপনার যদি ইচ্ছে করে আসবেন, ইচ্ছে না করলে আসবেন না।

—সুভদ্রর গান শুনবেন না ?

—ঐ সব গানগুলো আমি অনেকবার শুনেছি। অনেকবার শুনলে গানও খারাপ লাগে।

—আমার বেশ ভালই লাগছিল।

—তবে আপনি নিচে নেমে এলেন যে ?

—এখান থেকেও শোনা যাচ্ছে।

—পুকুরের ওপারটায় যাবেন ?

—চলুন।

একটা গোলাপ গাছ হেলে পড়েছিল। রুচিরা নিচু হয়ে গাছটাকে সোজা করে দিতে চেষ্টা করল, কিন্তু সেটার শিকড় আলগা হয়ে গেছে। রুচিরা খানিকটা মাটি ঠেলে দিল সেটার গোড়ায়—বৃষ্টির জলে হাত ধুয়ে নিল। তারপর প্রিয়ব্রতর দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বলল, এই সময় রুমাল বার করে দিতে হয়।

প্রিয়ব্রত রুমাল দিয়ে সিগারেটের প্যাকেট ও দেশলাই ভাল করে মুড়ে রেখেছিল—বার করতে একটু দেরী হল। রুচিরা ততক্ষণে আঁচলে হাত মুছে ফেলেছে। বলল, থাক, রুমাল আর চাই না। আমাকে একটা সিগারেট দিন তো—এই আমগাছটার তলায় দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট খাই।

প্রিয়ব্রত বলল, আপনি যখন নিচু হয়ে গোলাপের চারাটার যত্ন করছিলেন তখন আপনাকে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছিল। তার সঙ্গে সিগারেট খাওয়া মানায় না।

রুচিরা চোখ কুঁচকে বলল, ওসব ন্যাকামি আমার ভাল লাগে না। দেবেন তো দিন !

আমগাছটা বেশ বড়। কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে বৃষ্টি পড়ছে বলে ওর নিচে দাঁড়ালেও বড় বড় ফোঁটায় জল পড়ে। রুচিরা সবে মাত্র সিগারেটটা ধরিয়েছে। টপ টপ করে দু' ফোঁটা জল পড়ল সিগারেটের ওপর। ভিজে সিগারেট টানা যায় না। রুচিরা সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিল। আর একটা চাইল না, কোন অভিযোগ জানাল না, ভারী

খুশীর সঙ্গে বলল, আঃ কি সুন্দর লাগছে এই জায়গাটা।

প্রিয়ব্রত একটু বিস্মিত ভাবে তাকাল রুচিরার দিকে। এক একটা পরিবেশে মানুষ কি রকম বদলে যায়। কলেজে কিংবা কফি হাউসে রুচিরাকে বড় বেশী অহংকারী আর রুক্ষ মনে হয়। কিন্তু এই বাগানে, বৃষ্টির মধ্যে, পায়ে কাদা মাখা অবস্থায় তাকে কত সহজ আর সাবলীল মনে হয়। এ-রকম ভাবে বেড়াতে না এলে রুচিরার এই চেহারাটা প্রিয়ব্রত পেত না কখনো। এখন রুচিরার কোন চেহারা সত্যি, ক্লাসরুমের মধ্যে না এই প্রকৃতির মধ্যে?

রুচিরা বলল, চলুন, পুকুরটার ওদিকে যাই।

—বৃষ্টি কিন্তু এবার জোরে পড়ছে।

—পড়ুক।

পুকুরের ধারে ধারে কেয়ারি করা ফুলের বাগান। ওপারটায় একসারি কলাগাছ ও গাঁদা ফুলের ঝাড়। দুটো বক নিশ্চিন্তে বসে ভিজছিল, ওদের দেখে উড়ে গেল। কুলগাছের ডালে বিমর্ষ হয়ে ভিজছে একগণ্ডা দাঁড়কাক।

প্রিয়ব্রত বলল, সুভদ্র আপনাকে এতক্ষণ না দেখে নিশ্চয়ই গানে আর মুড পাচ্ছে না। গান থেমে গেল। বোধহয় আপনাকে খুঁজছে।

রুচিরা আঙুলের নোখ দিয়ে কলাগাছের গা চিরতে চিরতে বলল, সে জন্য আপনি বুঝি চিন্তিত?

—না, সে কথা বলছি না।

—তবে?

—সুভদ্র সম্পর্কে আপনি কি রকম যেন উদাসীন, কয়েকদিন ধরে দেখছি।

—কোনদিন খুব উৎসাহী ছিলাম?

—ছিলেন না?

—আপনি খুব বোকা। আমরা দু'জনে এখানে দাঁড়িয়ে থেকে অন্য কারুর সম্পর্কে আলোচনা করার কোন মানে হয়? যাই হোক,

আপনার কৌতূহল মেটাবার জন্য বলছি, সুভদ্রকে আমি দান করে দিয়েছি ঝর্ণাকে।

—দান করে দিয়েছেন? ছেলেরা বুঝি মেয়েদের সম্পত্তি?

—অনেকটা। অন্তত আমরা তাই মনে করি! ঝর্ণা বেচারা খুব ছেলেবেলা থেকেই সুভদ্রকে বিয়ে করবে বলে ভেবে রয়েছে।

—আশ্চর্য মেয়েরা!

—কিসের আশ্চর্য?

—ঝর্ণা ছেলেবেলা থেকেই সুভদ্রকে বিয়ে করবে বলে ঠিক করে রেখেছে। অথচ অন্য ছেলে-টেলেদের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশতে আপত্তি নেই।

—এতে আশ্চর্য হবার কি আছে? ছেলেরা এ রকম করে না? আপনি কোন যুগে পড়ে আছেন?

—বোধহয় খুব প্রাচীন যুগে।

—আপনার কোন জিনিস কিংবা আপনার নিজের সময়ও কি অনেক সময় অন্যের জন্য ব্যয় করেন না?

—আমরা ছেলেবেলায় একটা সংস্কৃত শ্লোক পড়েছিলাম, লেখনী পুস্তিকা ভার্যা পর হস্তং গতা গতা—মানে হচ্ছে কলম, বই আর স্ত্রী যদি একবার পরের হাতে যায়—

—থাক, আর মানে বোঝাতে হবে না। আর ছেলেরা পরের হাতে গেলেও কোন দোষ হয় না, এই তো? ওসব কথা বাদ দিন। আপনার নিজের কথা বলুন।

—আমার নিজের কথা?

প্রিয়ব্রত তাকাল রুচিরার দিকে। চুল ভিজে জবজবে। সারা মুখখানা ভেজা জল গড়াচ্ছে গাল বেয়ে। ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে তাকে। হঠাৎ সেদিকে তাকিয়ে অন্য একখানা মুখ মনে পড়ল প্রিয়ব্রতর। মাধুরীকে যেদিন সে ভয় দেখিয়েছিল, মাধুরীর সেই দিনকার কান্না-ভেজা মুখ। প্রিয়ব্রত একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল।

সেটুকু রুচিরার চোখ এড়ালো না। চোখে হাসির ঝিলিক তুলে জিজ্ঞেস করল, কি ভাবছেন? এ পেনি—

প্রিয়ব্রত বলল, কিছু না।

সঙ্গে সঙ্গে রুচিরার হাত ধরে একটা হ্যাঁচকা টান দিল। রুচিরা আর একটু হলে হুরমুড় খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল। প্রিয়ব্রত চাপা গলায় বলল, সাপ!

একটু দূরে দিয়ে একটা সরু সাপ খুব মন্থর গতিতে যাচ্ছে। মোটামুটি নিরীহ তার চেহারা। তবু সাপ সাপই। সেটাকে মারার জন্য প্রিয়ব্রত এদিক ওদিক তাকিয়ে একটা শক্ত কিছু খুঁজতে লাগল। একটা আধলা ইট পেয়ে সেটাকে তুলতে যেতেই রুচিরা তাকে বাধা দিয়ে বলল, মারবেন না!

সাপটা ওদের দেখেও একটুও গতি বাড়ল না। সড়াক সড়াক করে দু'বার জিভ বার করল, তারপর এঁকে-বেঁকে নেমে গেল পুকুরের জলে।

প্রিয়ব্রত বলল, বাপরে, এই পুকুরে সাপ থাকে! জানলে আগে সাঁতার কাটতুম না।

রুচিরা বলল, যে সাপ জলে থাকে, সে সাপের বিষ থাকে না। তা ছাড়া সাপটা এখানে বেশ মানিয়ে গেছে না? এই বৃষ্টি, কাদা, ফুলবাগান—এর মধ্যে ওরকম একটা সাপও মানিয়ে যায়।

—আপনার তো বেশ আর্টিস্টিক সেন্স আছে। তা হলে সায়েন্স পড়তে এলেন কেন?

—সায়েন্স পড়লেই বুঝি রসকষশূন্য হতে হবে?

—এখান থেকে চলুন এবার। আরও যদি সাপ থাকে? আমি সাপকে খুব ভয় পাই। আপনি ওটাকে মারতে দিলেন না—

হঠাৎ বৃষ্টিটা খুব জোর হয়ে এল। এর মধ্যে আর দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। ওরা দৌড়াতে শুরু করল, পুকুরটা ঘুরে এসে পৌঁছল বাড়িটার পেছন দিকে। দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল—এখানে

বৃষ্টির ছাট এলেও সম্পূর্ণ ভিজতে হচ্ছে না।

প্রিয়ব্রত বলল, ভেতরে যাবেন? তা হলে আর একটা দৌড় মেরে—

রুচিরা বলল, এইখানেই বেশ আছি। আমার খুব ভাল লাগছে।

—ওরা যদি আমাদের খোঁজে, তা হলে এখানে আমাদের দেখতে পাবে না—

—সেজন্য আমি মোটেই ব্যস্ত নই।

রুচিরার ব্যবহার, কথাবার্তা সব কিছুই অন্যরকম। চুল নিংড়ে নিংড়ে জল বার করতে লাগল। খোঁপা খুলে ফেলেছে, একরাশ চুল বুকের ওপরে। ভিজে শাড়ী-ব্লাউজের নিচে জেগে উঠেছে তার শরীরের সুঠাম রেখা।

বেশ কয়েক মিনিট দু'জন চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। রুচিরাই জিজ্ঞেস করল, কিছু বলছেন না যে?

—কি বলব, জানি না।

—অনেক সময় কথা বলার চেয়ে চুপ থাকাটাই বেশী ভাল লাগে। যারা এটা বোঝে, তাদের আমার খুব পছন্দ হয়।

কার্নিসের তলায় ওরা এত কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে যে দু'জনের কাঁধে কাঁধ ছোঁয়া। প্রিয়ব্রত আর কিছু না ভেবে তার একখানা হাত তুলে দিল রুচিরার দিকে। তার বুক কাঁপছে। সে আর পারছে না। তার এত কাছে এই সুন্দরী নারী—শরীর তো শরীর চায়। রুচিরাকে নিজের দিকে একটু আকর্ষণ করল প্রিয়ব্রত।

রুচিরা কিছু বলল না, সম্পূর্ণ মুখটা ফেরালো প্রিয়ব্রতর দিকে। সেই বৃষ্টি-ভেজা মুখ। চোখের পল্লবগুলো পর্যন্ত জলে ভেজা। সঙ্গে সঙ্গে প্রিয়ব্রতর মনে পড়ে গেল মাধুরীর মুখ। তার সামনে আর রুচিরা নেই। তার দিকেই একদৃষ্টিতে তাকিয়ে সে দেখতে লাগল মাধুরীকে। মাধুরীর সেই জলে ভেজা চোখ, তরল ঠোঁট। সেই মুখ তার এত বেশী চেনা যে সে এখন রুচিরাকে চিনতে পারছে

না। অনেকক্ষণ এইভাবে চেয়েছিল প্রিয়ব্রত, রুচিরা তার মুখের সামনে মুখ এনে জিজ্ঞেস করলো, এই, কি হলো কি?

প্রিয়ব্রত চমকে গিয়ে বললো, কে?

—আপনি কারুর ধ্যান করছেন বুঝি?

সঙ্গে সঙ্গে বিমর্ষ হয়ে গেল প্রিয়ব্রতর মুখখানা। ঠোঁট কুঁচকে গেল। রুচিরার কাঁধ থেকে হাত নামিয়ে নিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, চলুন, ভেতরে যাই।

রুচিরাও সহজ ভাবে বলল, চলুন।

বৃষ্টি সেই রকমভাবেই পড়ছে, কিন্তু এখন আর দোড়ল না! দু'জনেই নিঃশব্দ। একটা জায়গায় একটু পিছল থাকায় রুচিরা নিঃসংকোচে প্রিয়ব্রতর দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, একটু ধরুন।

সিঁড়িতে উঠে রুচিরা প্রিয়ব্রতর হাত ছেড়ে দিয়ে বলল, বেশ সুন্দর লাগল একসঙ্গে বেড়াতে। আপনাকে ধন্যবাদ। সর্বকিছুরই একটা মূল্য থাকে।

প্রিয়ব্রত আর একটাও কথা বলল না, ফ্যাকাসে ভাবে একটু হাসল শুধু।

॥ ১৩ ॥

খুব সকালবেলা মাধুরী তখনও ঘুম থেকে ওঠেনি। প্রিয়ব্রত এসে তার ঘরের দরজায় ধাক্কা দিল। মাধুরী দরজা খোলার পর প্রিয়ব্রত বলল, বৌদি, চল একটু বেড়িয়ে আসি।

মাধুরীর চোখের থেকে তখনো ঘুম যায়নি, বিস্মিতভাবে বলল, এখন? হঠাৎ এই শখ কেন? প্রিয়ব্রত চঞ্চলভাবে বলল, চল না! কি সুন্দর ঠান্ডা ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে।

—বাবা এখনো ওঠেননি। বাবাকে না বলে কি করে যাব?

—বাবা ওঠবার আগেই আমরা ফিরে আসব।

—দিব্যি ঘুমোচ্ছিলাম! এই ঠান্ডার মধ্যে ঘুমোতেই তো ভাল লাগে।

—না, চল!

—প্রিয়ব্রত এসে মাধুরীর ড্রেসিং টেবিলের টুলের ওপর গ্যাঁট হয়ে বসেছে। আয়নার মধ্য দিয়ে দেখছে মাধুরীকে।

মাধুরী মুখের সামনে হাত চাপা দিয়ে একটা হাই তুললে। তারপর বলল, তুই একটু বাইরে দাঁড়া, আমি শাড়িটা বদলে নিচ্ছি।

বাইরেটা সত্যি চমৎকার। রাত্তিরে বৃষ্টি হয়েছিল একটু একটু, এখন চমৎকার ফুরফুরে হাওয়া। গাছপালাগুলি সদ্যস্নাত। পৃথিবীময় একটা সাময়িক শান্তির ভাব।

ট্রাম-লাইনের পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে প্রিয়ব্রত বলল, কাল রাত্তিরে আমার একটুও ঘুম হয়নি।

মাধুরী সচকিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, কেন রে?

—কি জানি! একটু চোখ বুজলেই আজে-বাজে স্বপ্ন দেখছিলাম। উঠে জল খেলাম দুবার। কিছুক্ষণ ছাদে পায়চারি করলাম।

—শরীর-টরীর খারাপ হয়নি তো?

—না সে সব কিছু নয়। এমনিই খুব খারাপ লাগছিল। একবার ভাবলাম তোমাকে ডাকি।

—ডাকলি না কেন?

—কি জানি, তুমি আবার ভয় পেয়ে যাবে কি না! সেদিন তুমি যা ভয় পেয়ে গেলে! এমনি একটু ঠাট্টা করছিলাম।

মাধুরী চুপ করে রইল। হাঁটতে লাগল মুখ নিচু করে। প্রিয়ব্রত জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা বৌদি, সেদিন তুমি ওকথা বললে কেন, তোমাকে চাই না, তোমাকে চাই না! দাদা যদি সত্যিই ফিরে আসে, তুমি কি—

মাধুরী মুখ তুলে ধারালো ভাবে বলল, ওসব কথা বন্ধ করতো। আমি ওসব নিয়ে কোন আলোচনা করতে চাই না।

—কেন? দাদা যদি হঠাৎ ফিরে আসে তুমি চিনতে পারবে? তোমার আমার যেমন বয়েস বেড়েছে, সে রকম দাদারও তো বয়েস

বেড়েছে। এতদিনে দাদার প্রায় চল্লিশ হবার কথা। তবু তুমি আমাকে দেখে কি করে ভুল করলে?

—ভুল মানুষের হয় না?

—দাদার মুখখানা আমার আর ভাল করে মনে পড়ে না। এতদিন বাদে আমি বুঝতে পারছি, দাদা সত্যিই হারিয়ে গেছে।

হাঁটতে হাঁটতে ওরা টালিগঞ্জ ব্রীজ পেরিয়ে এসেছে। মাধুরী জিজ্ঞেস করল, এবার কোন্ দিকে যাবি? লেকের দিকে? হাঁটতে বেশ ভালই লাগছে।

—রোজ ভোরবেলা এরকম বেড়ালে বেশ হয় না?

—ক'দিন তোর উৎসাহ থাকবে?

—আমার ঠিকই থাকবে। ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে রাখব। আচ্ছা বৌদি, তুমি ভবিষ্যতে কি করবে, কিছু প্ল্যান করেছ?

—তার মানে?

—আমি কয়েকদিন ধরে আবার এই কথাটা ভাবছি। তুমি তোমার বাকী জীবনটা নিয়ে কি করবে?

—কি আবার করব? কেউ কি প্ল্যান করে জীবন চালায় নাকি? যে-রকম চলছে, সেই রকমই চলবে।

—বৌদি, তুমি বড্ড চাপা। মনের মধ্যে কি যে ভাবো তুমি, সেকথা আর কারুকে জানতে দাও না। তুমি বলতে চাও, তোমার কোন কষ্ট নেই?

—কত মানুষেরই তো কতরকম কষ্ট আছে। তুই হঠাৎ আমাকে নিয়ে এত মাথা ঘামাতে শুরু করলি কেন?

প্রিয়ব্রত কিছু একটা বলতে গিয়েও থেমে গেল। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, আমরা দু'জনে প্রত্যেকদিন ভোরবেলা এইরকম বেড়াতে বেরুব, যতদিন বেঁচে থাকব!

মাধুরী মুখ টিপে হাসল। প্রিয়ব্রতর এই ছেলেমানুষী প্রস্তাব সম্পর্কে কোন মন্তব্য করল না।

লেকে ঢুকতে যাবার আগে মাধুরী দেখতে পেল জীবনলাল লম্বা লম্বা পা ফেলে রাস্তা পার হয়ে যাচ্ছে। জীবনলালও মাধুরীকে দেখতে পেয়েছে কিনা বোঝা গেল না, তার মুখখানা নিচু করা, লম্বা শরীরটা একটুখানি ঝুঁকিয়ে সে হন হন করে হেঁটে যাচ্ছে। এমনও হতে পারে যে সভ্যজগতের আর কারুর দিকে তাকাবে না বলে সব সময় মুখ নীচু করেই থাকে।

মাধুরী থমকে দাঁড়িয়ে প্রিয়ব্রতকে বলল, ঐ যে ভদ্রলোককে দেখছিস, উনি আমাদের স্কুলে কাজ করেন। করেন মানে করতেন, এ মাস থেকে ছেড়ে দিয়েছেন। তুই যা বলছিলি, এর সেইরকম জীবন সম্পর্কে একটা পরিকল্পনা আছে।

—কি রকম?

—বাকি জীবনটা সভ্যজগতের বাইরে কাটাবেন।

—খুব ইন্টারেস্টিং তো। ডাকব ভদ্রলোককে? একটু আলাপ করব।

—না থাক! উনি একটু রুক্ষ স্বভাবের লোক। হয়তো অপমান করে কথা বলবে।

—কাকে? আমাকে? আমি ওসব গায়ে মাখি না।

—আমাকে করতে পারে।

প্রিয়ব্রত ভ্রু কুঁচকে অপসৃয়মান জীবনলালের দিকে তাকিয়ে রইল।

তারপর বলল, তোমাকে অপমান করবে? এত সাহস? আগে বল নি তোর এ কথা!

—বলার মতন এমন কিছু না।

—সুখেন তোমাকে আর জ্বালাতন করে না তো?

মাধুরী অবাক হয়ে বলল, সুখেন আবার কে?

—ঐ যে আমাদের পাড়ার একটা ফর্সা মতন ছেলে। তোমাকে রাতদিন ফলো করত।

—তোকে কে বলল ?

—তুমি না বললে কি আমি টের পাই না ? আমি ওকে কড়কে দিয়েছি। ও আর সাহস পাবে না। তোমাকে যদি কেউ অপমান করে, আমি তাকে এমন শিক্ষা দেব !

মাধুরী প্রিয়ব্রতর হাত ধরে মৃদু চাপ দিয়ে বলল, মাথা গরম করিস নি। ছিঃ, এরকম মাথা গরম করতে নেই !

সেইদিনই রাতদুপুরে প্রিয়ব্রত আবার এসে মাধুরীর ঘরে ধাক্কা দিল। মাধুরীর পাতলা ঘুম, শব্দ শুনেই জেগে উঠল। দরজা খুলে দেখল, প্রিয়ব্রত ফ্যাকাসে মুখে দাঁড়িয়ে আছে। মাধুরী জিজ্ঞেস করল, কি-রে, কি হয়েছে ?

প্রিয়ব্রত ধরা গলায় বলল, বৌদি, আমার একদম ঘুম আসছে না। আমি থাকতে পারছি না।

—কেন ভয় টয় পেয়েছিস নাকি ?

—না, আমার তলপেটে ব্যথা হচ্ছে খুব।

—কি রকম ব্যথা ?

—মুচড়ে মুচড়ে উঠছে। শুয়ে থাকতে পারছি না। তোমার কাছে কিছু ট্যাবলেট আছে ?

—না তো ! কি ট্যাবলেট ? বাবাকে ডাকব ?

—না, না, বাবাকে ডেকে কি হবে ?

—খুব বেশি ব্যথা ? যদি ডাক্তার ডাকতে হয় !

—এত রাত্তিরে ডাক্তার ডাকার দরকার নেই।

—তাহলে কি করবি বল তো ? নুন-জল খাবি ? নুন-জলে অনেক সময় ব্যথা কমে। জোয়ানের আরকও তো নেই।

—নুন-জল দাও।

বারান্দার এক কোণে খাবারের টেবিলের উপরেই নুন থাকার কথা। সেখানে নেই। রান্নাঘরের আলো জেবলে, নুন খুঁজে বার করল। এক খাবলা নুনের সঙ্গে প্রিয়ব্রত দু'গেলাস জল খেয়ে

ফেলল ঢক ঢক করে। তার পরেই বমি করে ফেলল বেসিনে। তার ফলেই প্রিয়ব্রত অনেক সুস্থ বোধ করল।

ওর পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে মাধুরী জিজ্ঞেস করল, এখন কেমন লাগছে ? ব্যথা কমেছে ? বদ হজম হলে অনেক সময় এরকম হয়।

প্রিয়ব্রত সিঁড়ির ওপর বসে পড়ে পাশের জায়গাটা দেখিয়ে মাধুরীকে বলল, এইখানে বসো না ! একটু গল্প করি।

—এখন গল্প করবি কি ? ঘুমোতে যাবি না ?

—তোমার খুব ঘুম পাচ্ছে বুঝি ? আমার খুব ইচ্ছে করছে এখন বসে বসে অনেকক্ষণ ধরে গল্প করি।

সারা বাড়ি অন্ধকার ও নিস্তব্ধ। মাঝে মাঝে শুধু গগনেন্দ্রর কাশির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

মাধুরী বলল, না ঘুমোলে শরীর খারাপ হবে। যা, গিয়ে শুয়ে পড় এখন। প্রিয়ব্রত আবদার করে বলল, আমার এখন একদম ইচ্ছে করছে না একলা একলা থাকতে।

—দিন দিন ছেলেমানুষ হচ্ছিস নাকি ?

প্রিয়ব্রত উঠে দাঁড়িয়ে মাধুরীর হাত টেনে বলল, বৌদি, প্লীজ, চল একটু ছাদে যাই। বেশীক্ষণ না, আধঘণ্টা।

অগত্যা মাধুরীকে আসতেই হল। এরকম গভীর রাত্রিতে কোনদিন সে ছাদে আসে নি। শুক্লপক্ষের রাত হলেও একটা পাতলা মেঘের ছায়ার জন্য ঠিক জ্যোৎস্না নেই—এক ধরনের আবছা আলোয় ছেয়ে আছে চরাচর। শহরময় দুঃখী ও সুখী মানুষরা সবাই এখন ঘুমন্ত।

প্রিয়ব্রত মাধুরীর পিঠে হাত রেখে বলল, খুব তো ঘুমোতে চাইছিলে ! এখন ভাল লাগছে না ? আমি প্রায়ই এই সময় ছাদে এসে দাঁড়াই।

মাধুরী প্রিয়ব্রতর দিকে ফিরে বলল, আগে এত ঘুমকাতুরে ছিলি, হঠাৎ সেই সব ঘুম কোথায় গেল ?

—সত্যি, আজকাল আর আমার ঘুম পায় না। সব সময় নানান কথা ভাবি।

—কি ভাবিস অত ?

—তোমার কথা।

—আমার কথা ? কি ভাগ্য আমার ?

—অন্য যা কিছু ভাবতে যাই, শুধু তোমার কথাই মনে পড়ে। মাকে অনেকদিন কাছে পাই নি, বাবাও অনেক দূরে সরে গেছেন—তুমি ছাড়া আমার আর কে আছে ?

—এখন বাইরের লোকজনের সঙ্গে মিশছিস, কত নতুন বন্ধু-বান্ধব হবে।

—তা আছে, কিন্তু তোমার মতন আমার আর কেউ নেই।

মাধুরী খুব আস্তে আস্তে বলল, প্রিয়, তোর কি হয়েছে বল তো ? ক'দিন ধরে দেখছি—

প্রিয়ব্রত মাধুরীর থুঁতনিতে আঙুল ছুঁইয়ে আবেগপ্লুত গলায় বলল, বৌদি তুমি কি সুন্দর ! তোমাকে ছেড়ে আমি কোনদিন থাকতে পারব না।

মাধুরী খুব মৃদু ভাবে, নিজেকে একটু দূরে সরিয়ে নেবার চেষ্টা করল। প্রিয়ব্রতর সর্বাঙ্গে উত্তাপ, তার আঙুলের স্পর্শে যেন আগুনের হল্কা। মাধুরী বলল, আমাকে ছেড়ে থাকবার প্রশ্ন উঠছে কি করে ? আমি কোথায় যাব ? আমার কি আর কোন যাবার জায়গা আছে ? এক যদি অনাথ আশ্রমে পাঠিয়ে দিস—

—বাজে কথা বোল না। তুমি এখন নিজে রোজগার করছ, তুমি ইচ্ছে করলেই আলাদা কোন জায়গায় থাকতে পার।

—কিন্তু যাব কেন ? তোকে আমি এইটুকু বয়েস থেকে দেখছি—তুই আমার ছোট ভাইয়ের মতন—তোকে ছেড়ে আমি কি থাকতে পারি ?

—তুমি থাকতে চাইলেও আমি তোমাকে থাকতে দেব না—

প্রিয়ব্রত মাধুরীকে দূরে সরে যেতে দেন নি। এবার আরও ঘনিষ্ঠভাবে কাছে টেনে আনল, মাধুরী কাঁধের কাছে মুখ ডুবিয়ে খুব কাতর গলায় বলল, আমি তোমাকে ছাড়ব না। আমি তোমাকে কিছুতেই ছাড়ব না।

—কি ছেলেমানুষী করছিস ? ছাড় আমাকে।

প্রিয়ব্রত মুখ তুলে বলল, বৌদি, আমি মোটেই আর ছেলেমানুষ নই ! তুমি আমাকে ছেলেমানুষ করে রেখে দিতে চাও ? তুমি আমাকে বন্ধু বলে মেনে নিতে পার না ? তুমি ছাড়া আমার আর কোন বন্ধু নেই—

মাধুরী হাসার চেষ্টা করে বলল, আচ্ছা বেশ বন্ধু ! এখন ছাড় তো আমাকে পাগলামি করিস না।

—না ছাড়ব না।

প্রিয়ব্রত দু'হাত দিয়ে মাধুরীকে জড়িয়ে ধরে নিজের মুখ কাছে এনে পাগলের মতন তার ঠোঁট খুঁজতে লাগল। মাধুরী এদিক ওদিক মুখ ঘুরিয়ে নিল বার বার। অত্যন্ত রেগে গিয়ে বলল, এবার কিন্তু আমার হাতে মার খাবি তুই। কি করছিস কি ? সত্যি মাথা খারাপ হয়ে গেছে তোর ?

—মারো, আমাকে যত ইচ্ছে মারো।

প্রিয়ব্রত মাধুরীর শরীরের স্বাদ পেয়ে গেছে। অন্ধের মতন সে মাধুরীর শরীর খুঁজতে লাগল।

ভয়ে দুঃখে কান্না পেয়ে গেল মাধুরীর। বুকের গভীর থেকে একবার শুধু উচ্চারণ করল, ছিঃ !

প্রিয়ব্রত রেগে গিয়ে বলল, তুমি আমাকে খারাপ ভাবছো ?

মাধুরী বলল, আমি কিছু ভাবছি না। তুই দয়া করে আমাকে ছেড়ে দে।

প্রিয়ব্রত উন্মাদ হয়ে গেল। দুই সবল বাহুতে মাধুরীকে সম্পূর্ণ বুকে চেপে ধরে মাথা ঝাঁকিয়ে বলতে লাগলো, আমি

তোমাকে ছাড়বো না, ছাড়বো না, কিছুতেই ছাড়বো না। তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচতে পারবো না।

শারীরিক ভাবে আহত হবার মতন মাধুরী গলা দিয়ে আওয়াজ করলো উঃ।

তারপর কোনক্রমে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে দৌড়ে চলে এল সিঁড়ির কাছে। সিঁড়ির কয়েক ধাপ মাত্র নামবার সঙ্গে সঙ্গেই তাকে এসে ধরে ফেলল প্রিয়ব্রত। আবার তাকে জড়িয়ে ধরে বলল, তোমার ছাড়া কারুকে ভালবাসি না। আর কারুকে নয়!

—ছাড়, ছেড়ে দে আমাকে।

—না ছাড়ব না।

—তুই কি চাস আমি আত্মহত্যা করি? আমাকে ছেড়ে দে!

—না, না, কিছুতেই না? তুমি আমাকে একটুও ভালবাসো না? আমি আর অন্য কারুকে ভালবাসতে পারব না।

—আমি মরে যাব। ঠিক, আমি কাল সকালেই মরে যাব।

—আমি তোমাকে বাঁচিয়ে রাখব।

জ্বলে উঠল সিঁড়ির আলো। নিচে পাংশু মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছেন গগনেন্দ্রনাথ।

প্রিয়ব্রত তার বাবাকে দেখেও বিচলিত হল না। ব্যাকুল ভাবে মিনতি করে মাধুরীকে বলল, তুমি এস, তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে।

মাধুরী ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, ছেড়ে দে, ছেড়ে দে—!

গগনেন্দ্র কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, প্রিয়, কি করছিস কি?

প্রিয়ব্রত মধ্যরাত্রির নিস্তব্ধতা ভেঙে প্রায় গর্জন করে উঠল, আমি গ্রাহ্য করি না। আমি কিছু গ্রাহ্য করি না!

কোনক্রমে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে মাধুরী তর তর করে নেমে গেল নিচে। নিজের ঘরে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দিল। প্রিয়ব্রত ও তার বাবার তর্কাতর্কি যাতে একবর্ণও তাকে শুনতে না হয়—এই

জন্য দুহাত দিয়ে কান চাপা দিল সে। কান্নার হেঁচকিতে তার শরীর কেঁপে কেঁপে উঠল।

আলো ফুটবার আগেই মাধুরী গুছিয়ে নিল একটা ছোট স্যুটকেস। সেটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে গগনেন্দ্রর ঘরের দরজায় ধাক্কা দিল। গগনেন্দ্র সম্ভবত জেগেই ছিলেন। তৎক্ষণাৎ দরজা খুলে বেরুলেন। মাধুরী তাঁকে প্রণাম করে বলল, বাবা, আমি কিছুদিনের জন্য অন্তত একটু আসছি।

—কোথায় যাচ্ছ?

—এলাহাবাদে দাদার বাড়িতেই এখন যাব।

—ও। এখনই কেন? একটু পরে—আমি তোমাকে স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে আসব।

—তার দরকার নেই। আপনি আমাকে ট্রামরাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দেন। সকালে যে ট্রেন পাব—

পায়ে চটি গলিয়ে গগনেন্দ্র বেরিয়ে এলেন। বাড়ির বাইরে পা দিয়ে আলোআঁধার মেশা জগতের দিকে তাকিয়ে নিম্নস্বরে বললেন, সবই আমার দোষ। মানুষ একটা ভুল করলে কি সারা জীবন তার ফল ভোগ করতে হয়?

—হ্যাঁ, ঘুমিয়েছে শেষ পর্যন্ত। এলাহাবাদ পৌঁছেই আমাকে চিঠি দিও।

দিনের প্রথম ট্রাম এল ঠন ঠন করে। গতকাল প্রায় এই রকম সময়েই প্রিয়ব্রত মাধুরী বেড়াতে বেরিয়েছিল। তখন প্রিয়ব্রত বলেছিল, সারা জীবন তারা প্রত্যেকদিন এই রকম ভাবে বেড়াবে। আজ মাধুরী জানে, সারাজীবনে আর কখনো তার সঙ্গে প্রিয়ব্রতর দেখা হবে না।

কয়েক স্টপ যাবার পরেই ট্রাম থেকে নেমে পড়ল মাধুরী। উঠে এল জীবনলালের বাড়ির চারতলায়।

জীবনলাল তার মধ্যেই উঠে পড়েছে। মাধুরীকে দেখে বিস্মিত

হল কিনা, তা পর্যন্ত বোঝা গেল না। একবার মাধুরীর দিকে তাকিয়েই আবার মুখ নিচু করল।

কিছুক্ষণ কেউ কোনো কথা বললো না। মাধুরী স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো, জীবনলাল টুকিটাকি হাতের কাজ সারছে। মাধুরীর দিকে আর সে তাকিয়েও দেখছে না।

মাধুরীই প্রথম বললো, আমি চলে এলাম।

জীবনলাল মুখ না তুলে বললো, আর এক ঘণ্টা পরে এলে আমি আর এখানে থাকতাম না আজই আমার শেষ দিন।

—তার আগেই তো এসেছি।

—কি চাই?

—সুটকেসটা নামিয়ে রেখে মাধুরী বলল, আমি জীবনে কারুর কাছে কিছু চাই নি। আপনার কাছে চাইছি। আপনি আমাকে আপনার সঙ্গে নেবেন?

জীবনলাল তখনও মুখ তুলল না। বিড় বিড় করে বলল, এটা শখের বেড়াতে যাওয়া নয়। দুদিন চারদিনের ব্যাপার নয়। এটা চিরকালের ব্যাপার।

—আমিও আর ফিরতে চাই না। আমার ফেরার জায়গা নেই। জীবনলাল খানিকটা রুক্ষ ভঙ্গিতে বললো, এটা ছেলেবেলা নয়। আমার কাছে এটা বেঁচে থাকার শেষ উপায়।

মাধুরী এক পা এগিয়ে এসে বললো, ছেলেখেলা করার সাধ্য আমার নেই। আপনি কি আসলে ফিরিয়ে দেবেন? জীবনলাল এবার পূর্ণ চোখ মেলে তাকাল। হঠাৎ খুব লাজুক হয়ে গেল সে। লজ্জা পাওয়া মুখে বলল, আমি জীবনে কোন কিছুই পাইনি। এই প্রথম পেলাম।

॥ ১৪ ॥

মধ্যপ্রদেশের এক জংলা পাহাড়ে, একটা ছোট ঝর্ণার ধারে একজন লোক অনেকক্ষণ ধরে ছিপ ফেলে বসেছিল। ঝর্ণাটিতে বেশ স্রোত,

মাঝে মাঝে দু' একটি মাছের রুপোলি ঝিলিকও চোখে পড়ে—কিন্তু এত স্রোতের মধ্যে মাছেরা টোপ গিলতে চায় না। লোকটির ধৈর্য তবু অসীম। তার পাশে শালপাতার ওপর রাখা এক গাদা পেয়ারা—লোকটি মাঝে মাঝে একটা পেয়ারা তুলে নিয়ে চিবুচ্ছে—আর ছিবড়েগুলো ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলছে জলে। লোকটির মুখে দাড়ি-গোঁপের জঙ্গল।

ধারে-কাছে কোন মানুষজনই নেই। মাঝে মাঝে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে হাওয়া ঘুরে গেলে সর সর একটা শব্দ হয়। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে একটা বাস-রাস্তাও আছে—দিনে চারখানা মাত্র বাস যায়, সেই বাসের শব্দ শুনে বোঝা যায় সময়।

কিছুক্ষণ বাদে একটি কিশোর ছুটতে ছুটতে এল ঝর্ণার কাছে। দূর থেকেই সে চ্যাঁচাতে লাগল, বড়া ভাই, বড়া ভাই!

লোকটি ছিপ গুটিয়ে উঠে দাঁড়াল। কাছেই একটা কেঁদ গাছের ডালে তার একটা থলে ঝোলানো ছিল, সেটা পেড়ে নিয়ে বলল, চল।

বনের মধ্যে দিয়ে সরু পায়ে চলা রাস্তা। খানিকটা উৎরাইয়ে গেলে কিছু ঘর-বাড়ি চোখে পড়ে, ছোট একটা গ্রামের মতন। প্রান্তবর্তী বাড়িটির আঙিনায় খাটিয়ার ওপর বসে একজন সুটটাই পরা সভ্য মানুষ। দাড়িওয়ালা লোকটি হাতের ছিপখানা ছুঁড়ে রাখল উঠোনের এক কোণে, তারপর হেসে বলল, কিরে জাফর?

জাফর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, দেব!

দেবব্রত বলল, বোস, বোস!

একজন মধ্যবয়স্কা সবল চেহারার মহিলা একটু দূরে ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণচোখে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে। দেবব্রত তার দিকে তাকিয়ে বলল, মাঈ, বোতলটা দে। আর দুটো গেলাস। তারপর জাফর, কেমন আছিস?

জাফর পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করে বলল, আমি ভালই আছি।

দেবব্রত হাত বাড়িয়ে বলল, দে আমাকে একটা সিগারেট দে।

দুই বন্ধু সিগারেট ধরাল। মাঝখানে দশ বছর দেখা হয়নি, তবু যেন কিছুই হয়নি। দেবব্রত একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, তোকে আমার খোঁজ দিয়েছে বাঙ্গাঁও-এর আক্রাম, তাই না? যেমন আক্রাম-এর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, সেদিনই বুঝেছিলাম। যাক, তুই এসেছিস ভালই করেছিস। কয়েকদিন থাকবি তো?

জাফর অল্প একটু হেসে বলল, আমি থাকব, না, তুই আমার সঙ্গে যাবি?

দেবব্রত বলল, আমি আর কোথায় যাব! আমি বেশ আছি। কয়েকদিন থাক, তা হলেই বুঝতে পারবি।

সেই মধ্যবয়স্কা মহিলা একটা বোতল ও দুটো গেলাস রেখে চলে গেল! বেশ কয়েকজন ছেলে-মেয়ে দূরে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে।

বোতল থেকে দুটো গেলাসে খানিকটা করে দুর্গন্ধ তরল পদার্থ ঢেলে একটা গেলাস দেবব্রত বাড়িয়ে দিল জাফরের দিকে। জাফর একটু চুমুক দিয়েই মুখ বিকৃত করল, দেবব্রত অম্লানবদনে সেটা খেয়ে ফেলল ঢক ঢক করে। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে ঠোঁট মুছল। একটা কচি নধর ছাগল ছুটতে ছুটতে চলে এল খাটিয়ার কাছে, দেবব্রত আদর করে সেটার গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বলল, আজ এটাকে কাটব।

জাফর গেলাসটা নামিয়ে রেখে বলল, তুই কি করছিস এখানে?

দেবব্রত নিরাসক্তভাবে বলল, জমিতে খাটি, শিকার করি, মাছ ধরি, খাই, ঘুমোই। আর কি করব? সবাই যা করে, তাই করছি।

—এর মানে কি?

—মানে কিছুই হয় না। তুই যে ভাবে বেঁচে আছিস, তারই বা কি মানে হয়? তুই বড় চাকরি করছিস নিশ্চয়ই? শাদী করেছিস?

—হ্যাঁ।

—কাকে? আমার সেই বোনকে?

—না।

—কেন, আমার বোনকে বিয়ে করলি না কেন? পছন্দ হলো না?

—সে কথা থাক।

—ও, জাতের গণ্ডগোল নিয়ে আপত্তি উঠেছিল বুঝি? হাঃ—হাঃ—হাঃ।

—দেব, তুই হাসছিস?

—আমিও বিয়ে করেছি আবার—তিনটে বাচ্চা হয়েছে।

—আবার বিয়ে করেছিস?

—হ্যাঁ, কি হয়েছে তাতে। বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে তো কেউ মামলা করতে যাবে না। বিয়ে না করে কোন মেয়েমানুষ নিয়ে এসব জায়গায় থাকা যায় না—শহরের মতন।

—জীবনটা এরকমভাবেই নষ্ট করে দিবি ঠিক করেছিস?

—এর নাম বুঝি নষ্ট করা?

—শুধু নিজের জীবন নয়, অনেকগুলো জীবন। এক জায়গায় ঘরসংসার সাজিয়ে, তারপর সে সব ফেলে এসে এই জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে থাকার আর কি মানে হয়? তাহলে আর কষ্ট করে লেখা-পড়া শিখলি কেন?

—লেখাপড়া যদি না শিখতাম—সেই সুযোগ যদি না পেতাম, তাহলে তো এই রকমভাবেই থাকতাম। তুই বোস, আমি তোর খাওয়ার ব্যবস্থা করি।

জাফর দেবব্রতর হাত চেপে ধরে বলল, ব্যবস্থা করতে হবে না। আমি বেশীক্ষণ থাকব না।

—পাগল নাকি! না খেয়ে তুই যেতে পারবি? জোর করে ধরে রেখে দেব। আমি এ গাঁয়ের জোতদার প্রায় বলতে পারিস—আমার কথা সবাই শোনে। গাড়িতে এসেছিল? কোথায় রেখেছিস গাড়ি? পীচ রাস্তায় তো? এখান থেকে গাড়ি চুরি হয় না। ড্রাইভার যদি থাকে, তাকে খবর পাঠিয়ে দেব এখন। তোর সম্মানে আজ এই

ছাগলটা কাটব।

—না।

—আরে, তোর জন্য আজ সবাই মাংস খেতে পাবে আজ।

—অন্য কারুর কথা জানার আগ্রহ তোর নেই দেখছি। তোর বাবা-মা, মাধুরী।

—সবাই ভাল আছে নিশ্চয়ই?

জাফর একটুখানি চুপ করে রইল। নিঃশব্দে সিগারেট টানতে লাগল। তারপর বলল, তোর জন্মের কথা আমি আগে থেকেই জানতাম। হায়দ্রাবাদে দু'একজন জানে। কিন্তু আমি কখনো ভাবতেই পারিনি—তোর মতন একজন লেখাপড়া জানা ছেলে এ ব্যাপারটাকে এত গুরুত্ব দেবে। জন্মটা তো একটা অ্যাকসিডেন্ট। মানুষ কি করে নিজেকে তৈরী করে সেটাই বড় কথা।

দাঁড়ি-গোঁফের জঙ্গল ভেদ করে দেবব্রত পরিপূর্ণ ভাবে হাসল। হাসতে হাসতে বলল, তুই যদি হঠাৎ কখনো শুনিস তুই বেজন্মা, তাহলে তোর মনের অবস্থা কি রকম হবে? না, সেটা তুই বুঝতেই পারবি না—কারণ তুই কখনো সেকথা শুনিস নি। সেইজন্যই তোর পক্ষে মনে করা সম্ভব যে জন্মটা একটা অ্যাকসিডেন্ট।

—তুই বোম্বাইতেই প্রথম শুনলি।

—তার আগে একটু একটু যেন সন্দেহ হত, খুব ছেলেবেলার দু-একটা স্মৃতি মনের মধ্যে নড়াচড়া করত কিন্তু কখনো ঠিক বুঝতে পারিনি। বোম্বাইতে আমি যখন চার্চগেটের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলাম, সেইসময় একজন এসে আমাকে বিদ্রূপ করে বলল, ইঃ, ওর মা এখন হসপিটালে মারা যাচ্ছে—আর ও এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট ফুঁকছে—তখন লোকটাকে প্রথমেই আমার একটা থাপ্পড় মারতে ইচ্ছে হয়েছিল। কিন্তু মারতে পারিনি কারণ, ঐ কথার একটা বিষের মতন প্রতিক্রিয়াও আছে। আমার মুখখানা রক্তশূন্য হয়ে গিয়েছিল। আমি অস্ফুট গলায় বলেছিলাম, কি?

জাফর জিজ্ঞেস করলো, সেই লোকটি কে?

—একজন আদিবাসী বুড়ো। দেখে চাকর-বাকর ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। কিন্তু সে-ই আমার সৎ-বাবাও হতে পারত। সে আবার বলল, নিজের মায়ের জন্য তো কিছু করবি না—বিশ-পঞ্চাশটা টাকা দে—নইলে সে বিনা চিকিৎসায় মরবে।

—সেই বুড়োটি তোকে দেখে চিনতে পেরেছিল?

—পারবে না কেন? আমি তাকে চিনি না, কিন্তু সে হয়তো আমাকে মাঝে মাঝে দেখেছে। পরে আমার মনে হয়েছিল, খুব ছেলেবেলায় আমি ঐ লোকটিকে আমাদের বাড়িতে কয়েকবার দেখেছি।

—ওর কথা আমি আগে শুনিনি।

—ওদের কথা কেউ শোনে না। ওদেরই বলে অবাঞ্ছিত ব্যক্তি তৃতীয় ব্যক্তি। ও একজন দুর্বল মানুষ। ও একজন বিপজ্জনক যুবতীকে বিয়ে করেছিল—যাকে সামলাবার ক্ষমতা ওর ছিল না। তিনজন পুরুষের কাছে সেই যুবতীর সর্বসমেত সাতটি বাচ্চা হয়—তার মধ্যে আমি একজন।

বোতল থেকে আরও খানিকটা পানীয় ঢেলে দেবব্রত এক চুমুকে শেষ করল। সিগারেটের বদলে এবার একটা নিজের হাতে গড়া বিড়ি ধরিয়ে বলল, বাকিটা শুনতে চাস? কি হবে শুনে? শুনলেও তুই বুঝতে পারবি না। সবটা বুঝতে হলে তোকে এখানে কিছুদিন থেকে তারপর বুঝতে হবে। এই জগতের জীবন খুব সুখের নয়। এখান-কার অধিকাংশ মানুষই বছরে দু'মাস খেতে পায় না। খিদের জ্বালায় তারা চাকরি খুঁজতে বেরোয়—শহরে গিয়ে ঝি-চাকরের কাজ করে। হায়দ্রাবাদে গগনেন্দ্র সরকার যখন অবিবাহিত অবস্থায় একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকেন, তখন তাঁর একটি যুবতী ঝি ছিল। এখানকারই একটি পাহাড়ী মেয়ে। খুবই দুর্দান্ত তার স্বাস্থ্য। গগনেন্দ্র সরকারের মুহূর্তের ভুল হয়ে যায়। এরকম ভুল তো হতেই পারে।

আদিবাসী মেয়েদের নিয়ে ফূর্তি করা তো নতুন কিছু নয়। কিন্তু যারা ফুর্তিবাজি হয়, তারা নিজেদের বাঁচাতেও জানে। গগনেন্দ্র ঠিক সে ধরনের মানুষ ছিলেন না। উনি ছিলেন সৎ লোক। কিন্তু সৎ লোকদেরও কি এক-আধবার ভুল হয় না। সেই ঝিয়ের গর্ভে তাঁর একটি বাচ্চা জন্মায়। বাচ্চার কথাটা গগনেন্দ্র সরকার বিশ্বাস করেন নি—কিছু টাকা দিয়ে তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। তা ছাড়া আর কি-ই বা করার ছিল—যুবতী ঝিটি আগে থেকেই বিবাহিতা, গগনেন্দ্র ইচ্ছে করলেও তাকে বিয়ে করতে পারতেন না। বড়জোর সারা জীবন রক্ষিতা রাখতে পারতেন। কিন্তু একবার ভুল করলেও তিনি সেরকম মানুষ ছিলেন না। এরকম একটা আধটা ভুল জীবনে চাপা পড়ে যায়। কিন্তু ঐ ঝিয়ের স্বামী ভাল লোক ছিল না—অবৈধ সন্তানকে দেখিয়ে বার বার টাকা আদায় করত। বিয়ে করে গগনেন্দ্র সরকার যখন সংসার পেতে বসেছেন তখনও তারা এসে উৎপাত করে। ছেলেটির বয়েস যখন পাঁচ বছর—তখন দেখা যায় তার মুখের আদল অবিকল গগনেন্দ্রর মতন। যে দেখবে সে-ই বলবে। সেই অবস্থায় বাঁচিয়ে দিলেন গগনেন্দ্রর স্ত্রী মন্দাকিনী। তিনি ছেলেটিকে নিজের কাছে রাখতে চাইলেন। সতী-সাধ্বী রমণী তিনি—সারা জীবনে এ নিয়ে স্বামীকে কখনো গঞ্জনা দেন নি—ছেলেটিকে মানুষ করেছিলেন নিজের সন্তানের চেয়েও বেশী আদরে। ভাল কথা, উনি কেমন আছেন?

জাফর মৃদু গলায় বলল, উনি মারা গেছেন।

দেবব্রত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাটির দিকে তাকিয়ে বলল, অনেক মানুষই মাতৃস্নেহের স্বাদ পায় না। আমি পেয়েছিলাম। যাই হোক, গগনেন্দ্র সেই দাসী আর তার স্বামীকে বেশ কিছু টাকা দিয়ে সেই তল্লাট একেবারে ছেড়ে যাবার কড়ার করিয়ে নিয়েছিলেন। তারা ফিরে এসেছিল নিজের গাঁয়ে, কিন্তু দু'বছর বাদে সব টাকা ফুরিয়ে গেল আবার কাজ খুঁজতে যায় বোম্বাই। সব সময়েই মেয়েটির

কাজ পেতে অসুবিধে হয় না তার ঐ স্বাস্থ্যের জন্য, পুরুষটি কাজ পায় না। বোম্বাইতেও সেই একই ইতিহাস। এক বাড়ি ছেড়ে আর এক বাড়ি। তার স্বামী মাঝে মাঝে গগনেন্দ্রর কাছ থেকে চাপ দিয়ে টাকা আদায় করে। এদিকে আমি বড় হচ্ছি, লেখাপড়া শিখছি, বিজ্ঞান, শিল্প, সমাজ, দর্শন নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি—আর আমার আড়ালে এই সব ঘটে যাচ্ছে, যার আমি কিছুই জানি না।

জাফর বললো, আমি আর শুনতে চাই না।

দেবব্রত হাসতে হাসতে বললো, কেন? খারাপ লাগছে? নোংরা গল্প।

জাফর একটু রাগের সঙ্গে বললো, এসব ঘটনা সত্যি হলেও তোর এই ব্যবহারের কোন যুক্তি নেই। সারা জীবনে যাদের সঙ্গে স্নেহ ভালবাসা, বন্ধুত্বের সম্পর্ক হলো—তাদের কোনো মূল্যই নেই? জন্মের ইতিহাসটাই বড়?

দেবব্রত একটুক্ষণ চুপ করে রইলো। গেলাসে আবার পানীয় নিয়ে চুমুক দিয়ে বললো, আমি কি এ কথা ভাবিনি? দশ বছর ধরে অনবরত ভেবেছি। কোনো উত্তর খুঁজে পাইনি। বোম্বাইতে সেবার যখন প্রথম সব শুনলাম, প্রথমেই আমার কি মনে হয়েছিল জানিস, জাফর? আমার মনে হয়েছিল, সেই বুড়োটাকে খুন করে ফেলি, আর হাসপাতালে গিয়ে সেই মেয়েছেলেটাকে বিষ খাওয়াই। যে জীবন যাপনে আমি অভ্যস্ত সে জীবন আমি কিছুতেই ঠিক রাখতে পারব না—যদি এরা দু'জন বেঁচে থাকে। আমাদের শিক্ষা-দীক্ষা আমাদের একটা বংশাভিমানও দেয়। ভদ্রসমাজে যদি প্রকাশ হয়ে পড়ে আমি একটি দাসীর ছেলে, কলঙ্কিত আমার জন্ম—তা কি আমি সহ্য করতে পারব? ওরা দু'জন যতদিন বেঁচে থাকবে—ততদিন আমার সেই ভয় থাকবে। আর একটা উপায় ছিল, সব কিছু-ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে নতুন কোন জায়গায় গিয়ে নতুন ভাবে জীবন শুরু করা। কিন্তু আমি হাসপাতালে না গিয়ে পারলাম না।

জাফর জিজ্ঞেস করল, উনি বেঁচে উঠেছিলেন ?

দেবব্রত আবার গলা ভিজিয়ে নিয়ে বলল, হাসপাতালে গিয়ে দেখলাম, সেই দাসী অর্থাৎ আমার মা—তাকে কেউ ছুরি মেরেছে—সেই অবস্থায় হাসপাতালে আনা হয়েছে। বাঁচার আশা খুবই কম। তার বয়েস তখন ছেচল্লিশ সাতচল্লিশের কম নয়—তবু দারুণ স্বাস্থ্য, দেখলে তিরিশ-পঁয়তিরিশের বেশী মনে হয় না। সেই স্বাস্থ্যের জন্যই বেঁচে গেল। চার পাঁচ দিন যমের সঙ্গে লড়াই চলেছিল, আমি সব সময় কাছাকাছি ছিলাম।

জাফর বলল, তখন কি তোর বাড়িতে একটা খবর দেওয়া উচিত ছিল না ?

—কি খবর দেব ? কাকে খবর দেব ?

—বাড়ির কারুর কথা মনে পড়েনি ?

—তখন সব কিছুর মিথ্যে মনে হয় না ? বার বার কি এই কথাটা আমার মনে না হয়ে পারে যে আমার জন্মের পর আমার বাবা আমাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন ? আমার সৎ-বাবা যদি টাকার লোভে আমাকে নিয়ে ফিরে না যেত—তাহলে কি আমি সভ্যতা-সংস্কৃতির বড়াই করতে পারতাম ? দাবা খেলার একটা চালে ভুল হলে যেমন সব খেলাটাই বদলে যায়।

—মাধুরীর তো কোন দোষ ছিল না !

—সে সরল মেয়ে, তার এসব না জানাই ভাল।

—দেব, তবু আমি একটা ব্যাপার কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না। আজকাল অনেক নিচু বংশের ছেলেও তো লেখাপড়া শিখে সমাজে উঁচু জায়গা করে নেয়। সুতরাং এতে এত গুরুত্ব দেবার কি আছে ?

—হরিজনের ছেলের মন্ত্রী হওয়া ? সেটা আলাদা গল্প। সে গল্প আমার সঙ্গে মেলে না। আমার জন্মের মধ্যে আছে নোংরামি—অনভিজাত্যের গর্ব নেই। সভ্যসমাজেও এরকম অনেক নোংরামি

থাকে—কিন্তু সেগুলো চাপা দেওয়াই থাকে সাবধানে—আমার বেলায় বাইরে এসে পড়েছে। মাধুরীর কাছে আমি আর সেই আগেকার মানুষ হয়ে ফিরে যেতে পারতুম না। আমার বাবার সঙ্গে কি আমি আগের মতন একই ভাবে কথা বলতে পারতাম ? কেউ পারে ? না জেনে যদি কারুর এঁটো জল খেয়ে ফেলি আমরা—যতক্ষণ না জানা থাকে ততক্ষণ কিছুই মনে হয় না, কিন্তু জানতে পারলেই মুখটা কিরকম বিস্বাদ হয়ে যায়। আমারও মনটা সেরকম বিস্বাদ হয়ে গেল। ওদের সঙ্গে আমি এই গ্রামের বাড়িতে চলে এলাম। ওরা আনতে চায়নি—ওরা চেয়েছিল আমি শহরে থেকে চাকরি-বাকরি করে ওদের টাকা পাঠাই—আমি চেয়েছিলাম জোর করে জেদের বশে। প্রথম প্রথম খুব কষ্ট হত, অসহ্য লাগত, এমন কি দু'একবার আত্মহত্যার কথাও ভেবেছি। কিন্তু সরল জীবন-যাপনেরও একটা নেশা আছে। একবার আত্মহত্যা করতে গিয়েও পারিনি। এখন মনে হয়, কিছুতেই কিছু যায়-আসে না। বেশ চলে যাচ্ছে।

—আমি এসেছি বলে তুই বিরক্ত হয়েছিস ?

—না, বিরক্ত কেন হব ?

—একবারও তোর ইচ্ছে করে নি ফিরে যেতে ? তোর কি এইটুকু বিশ্বাসও ছিল না যে মাধুরীকে সব খুলে বললে, সে সবই মেনে নেবে ? ভালোবাসার কাছে এসব তুচ্ছ নয় ?

—সমস্ত সভ্য সমাজের ওপর আমার অসম্ভব রাগ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মাধুরীকে ভুলতে পারি নি। মাধুরীর কথা মনে পড়লেই বুকের মধ্যে যে কি অসহ্য কষ্ট হতো, তোকে কি করে বোঝাবো। সে কষ্টের তুলনা নেই। তবু সে কষ্ট আমি সহ্য করেছি মাধুরীর জন্যই।

—মাধুরীর জন্য ?

—হ্যাঁ।

—তোদের বাড়ির কেউ এখন আর হায়দ্রাবাদে থাকে না।

—একটাই আমার বাড়ি। সেই বুড়ো মারা গেছে—আমিই এর মালিক—আমি বেশ কিছু জমি বাড়িয়েছি—লেখাপড়া জানি বলে মহাজনরা ঠকাতে পারে না। চল, তোকে চারিদিকটা ঘুরে দেখাই। আমার এক ছেলেকে মিশনারিদের স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছি—যদি ভাল করে লেখাপড়া শেখে ও হয়তো একদিন মন্ত্রী হবে—তুই যা বলছিলি, হরিজন থেকে মন্ত্রী। আমি যা আছি, বেশ আছি।

জাফর একটু চুপ করে থেকে বলল, যে সংসার তুই ছেড়ে চলে এসেছিস হঠাৎ—তোর অভাবে সেখানে কি হয়েছে, তোর একবারও জানতে ইচ্ছে করে না?

দেবব্রত উদাসীনভাবে বলল, কি আর হবে? একজন মানুষ সরে গেলে এমন কিছুই আসে যায় না। হঠাৎ কেউ পাগল হয়ে যায়, কেউ দুর্ঘটনায় মরে—কিছুদিন তাই নিয়ে আলোড়ন হয়, তারপর সব ঠিক হয়ে যায়। আমি জানি, সব ঠিক হয়ে গেছে।

জাফর বললো, কিছুই ঠিক হয় নি। ওরা সবাই কলকাতায় চলে গেছে। আমি যা খবর পেয়েছি, ওরা কেউই আর জীবনে শান্তি পায় নি। তুই একবার যদি যাস আমার সঙ্গে কলকাতায়।

দেবব্রত তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, নাঃ! ওরা আর আমার কেউ নয়।

জাফর একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল তার প্রাক্তন বন্ধুর দিকে। দেবব্রতর স্বাস্থ্য আরও অনেক ভাল হয়েছে, বয়েসের তেমন কোন ছাপ পড়েনি এখনো। কিন্তু দাড়ি-গোঁফ সত্ত্বেও তার মুখে এক গভীর বিষাদের ছাপ পড়ে আছে চিরস্থায়ী হয়ে। তার কথায় দুঃখের সুর নেই, কিন্তু জন্মদাগের মতন ঐ ছাপ আর উঠবে না।

দেবব্রত জাফরের চোখের দিকে তাকিয়ে হাসল। বলল, আমার জন্য চিন্তা করিস না, আমি ভালই আছি রে। তোর কথা শোনাই হল না। চল একটু ঘুরে আসি।

দুজনে পাশাপাশি মন্থর পায়ে হেঁটে গেল সেই ঝর্ণাটার দিকে।

তবু দেবব্রতকে একদিন আসতে হলো কলকাতায়। হাওড়া স্টেশনে সে নামলো ট্রেন থেকে, মোটা ধুতি ও সুতোর কোট পরা একজন মানুষ। তার মুখে মিটিমিটি হাসি। পাহাড়ী গ্রামটায় সে তো বেশ ছিল, এখানে এই সভ্যজগতে তো আবার না এলেই পারতো। মানুষের বুকের মধ্যে হাওয়া এক একবার চঞ্চল হয়ে ওঠে, সারাজীবন ধরে একটানা ভাবে মানুষ বুঝি স্বাভাবিক থাকতে পারে না। তাই তাকে আসতে হলো, নাটকের শেষ দৃশ্যে অতি নাটকীয় চরিত্রের মতন। এককালে সে ছিল বিলেত ফেরৎ ইঞ্জিনিয়ার—এখন এসেছে গ্রাম্য চাষীর ভূমিকায়, তাই বোধ হয় তার মুখে ঐ রকম হাসি লেগে আছে। সে নিজেই উপভোগ করছে তার এই অবস্থার।

চুলগুলি অবিন্যস্ত, মুখ ভর্তি দাড়ি-গোঁফ, দেবব্রত হাঁটতে হাঁটতে স্টেশন ছেড়ে এসে দাঁড়ালো গঙ্গার ধারে। রাস্তাঘাটে হাওড়ার ব্রীজে গিসগিস করছে মানুষ। সবাই ব্যস্ত, কারুর দিকে তাকাবার সময় নেই। এদের প্রত্যেকেরই জীবনের একটা আলাদা গল্প আছে। কেউ কারুর গল্প জানে না—তাই প্রত্যেকের চোখেই অন্যকে অতি সাধারণ মনে হয়।

গঙ্গার ওপারে কলকাতা শহর। এই শহর দেবব্রতর চেনা নয়। অনেকদিন আগে একবার মাত্র এখানে সে বেড়াতে এসেছিল—তখন সব কিছুই বিস্ময়কর মনে হয়েছিল। এখন মনে হচ্ছে, এত বড় শহর থেকে কোনো কিছুই খুঁজে পাওয়া খুব কঠিন। এই শহরের রাস্তাঘাট সম্পর্কেও তার স্পষ্ট ধারণা নেই।

দেবব্রত কাছাকাছি একজন মানুষকে জিজ্ঞেস করলো, টালিগঞ্জ কোন্ দিকে? অভ্যাসবশতঃ সে হিন্দীতেই প্রশ্ন করেছিল। তার চেহারা ও বেশবাসের জন্য তার মুখে হিন্দী কথা মোটেই বেমানান লাগলো না।

লোকটি বললো, টালিগঞ্জ অনেক দূরে।

দূরকে দেবব্রত ভয় পায় না। ইদানীং সে বহু দূরে দূরের রাস্তা হেঁটে হেঁটে যায়। তার জানা দরকার ছিল কোন্ দিকে হাঁটতে হবে। কিন্তু সব ভেবে চিন্তে সে একটা ট্যাক্সি নেওয়াই ঠিক করে ফেললো। এই জন্য লাইনে দাঁড়াতে হলো তাকে। সময় কাটাবার জন্য সে এক ঠোঙা ছোলাভাজা কিনে চিবুতে লাগল।

কলকাতা শহর বড় ব্যস্ত, বড় অস্থির। কোনো কিছুই এখানে শান্তভাবে হবার উপায় নেই। একটু বাদেই কী একটা গোলমাল শুরু হয়ে গেল। দেবব্রতর সেদিকে মনোযোগ দেবার দরকার নেই, সে তো এখানকার কেউ নয়।

একটুবাদেই দেবব্রত টের পেল, গোলমালটা ট্যাক্সির লাইন বিষয়েই। কে যেন লাইন ভেঙে বে-আইনি ভাবে এগিয়ে গেছে, কে যেন লাইন না দিয়েই সুযোগ নিতে এসেছে, কে যেন প্রতিবাদ করেছে। রীতিমতন একটা হট্টগোল। একজন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান পুলিশ অফিসার সেখানে ডিউটিতে ছিল। সে এসে গোলমাল থামাবার জন্য লোককে বকাবকি এবং ধাক্কাধাক্কি শুরু করলো। লোকটির ব্যবহার অতি রুক্ষ। দেবব্রত কাছাকাছি আসতেই লোকটি দেবব্রতকে এক ধাক্কা দিয়ে বিশ্রীভাবে বললো, হঠ যাও!

হঠাৎ রাগ হয়ে গেল দেবব্রতর। সে অত্যন্ত কড়া গলায় বললো, লিস্ন সার্জেন, দা ওয়ে ইউ আর বিহেভিং—

দেবব্রতর মতন একজন গ্রাম্য পোশাক পরা দাড়ি-গোঁফওয়ালা মানুষের মুখ থেকে চোস্ত উচ্চারণের ইংরেজী শুনে হকচকিয়ে গেল সার্জেনটি।

দেবব্রতও কম অবাক হয় নি। তার ভেতরকার বিলেৎ ফেরৎ অহংকারী সামাজিক মানুষটি এখনো মরে যায় নি; এত বছর বাদেও হঠাৎ সেই মানসিকতার প্রকাশ পেয়ে যায়। কিন্তু এসব তো সে নির্বাসন দিতেই চেয়েছিল। নিশ্চয়ই শহুরে আবহাওয়ার প্রভাব।

দেবব্রত তৎক্ষণাৎ মুখভঙ্গি পাল্টে বিনীতভাবে বিগলিত হাস্যে

বললো, মেরা লিয়ে এক ট্যাক্সি—আপ জেরা মেহেরবাণী করকে···।

ট্যাক্সি হাওড়া ব্রীজ ও ষ্ট্রাণ্ড রোডেই জটলা পার হয়ে ময়দানের রাস্তায় পড়েছে। এখন এই শহরকে খুব সুন্দর দেখায়। অনেক নতুন নতুন বাড়ি উঠেছে, অনেক নতুন মূর্তি। দেবব্রত ট্যাক্সি-ওয়ালাকে সে সম্পর্কে প্রশ্ন করছে। ট্যাক্সিচালক বাঙালী। সে দেবব্রতকে অজ্ঞ দেশওয়ালী ভেবে তুম্ সম্বোধনে কথা বলছে অবজ্ঞার সঙ্গে। তাতে দেবব্রতর কোন ক্ষোভ নেই। সে এতে অভ্যস্ত। সে নিজে যখন সুট টাই পরে ঘুরতো—তখন কখনো কোনো গ্রাম্য চেহারার লোককে কি আপনি বলেছে? পোষাকের মর্যাদা কতখানি তা সে হাড়ে হাড়ে বোঝে। পোশাক কিংবা ইংরাজী জ্ঞান।

ট্যাক্সি ছেড়ে নম্বর মিলিয়ে বাড়ি খুঁজে পেতে দেবব্রতকে কিছুটা বেগ পেতে হলো। কোনো কিছু খোঁজার জন্যও একটা অভ্যেস লাগে। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত ঠিক নম্বরে পৌঁছে গেল এক সময়ে।

বাড়িটার সামনে কিছুক্ষণ সে দাঁড়িয়ে রইলো চুপ করে। তার মুখেই সেই মিটিমিটি হাসিটুকু মিলিয়ে গেছে। সে ভাবছে, এখানে কেন এসেছে সে? এ সব কিছুরই তো পাট সে চুকিয়ে দিয়েছিল। তবু কেন এতদূরে ছুটে আসা? জাফর-এর সঙ্গে দেখা না হলে সে বোধ হয় আর কোনদিনই এই জীবনের কথা ভাবতো না। এ জীবনের সঙ্গে তার আর কোনো সম্পর্ক নেই। সে তো বেশ ছিল! দেবব্রত কোনো উত্তেজনাও বোধ করছে না। তার মন খারাপ লাগছে। এখনো ফিরে গেলে ভালো হয়। তার ফিরে যাওয়াই উচিত। আর কেউ না, মাধুরীর সঙ্গে দেখা হলে সে কি বলবে?

দেবব্রত দরজায় একটু ধাক্কা দিতেই দরজা খুলে গেল। বসবার ঘরটা ফাঁকা। কয়েকটি চেয়ার এলোমেলোভাবে ছড়ানো, একটা খবরের কাগজের পৃষ্ঠাগুলো হাওয়ায় উড়ছে।

বাড়ীর ছেলে বাড়ী ফিরলে কি সবসময় কলিং বেল বাজায়? দরজা খোলা পেলে সে ঢুকে পড়ে। বসবার ঘরে কেউ নেই দেখে

তবু দেবব্রত বেল বাজালো।

গগনেন্দ্রনাথ কাছাকাছিই ছিলেন, ব্যস্তভাবে চটি ফটফটিয়ে এসে বললেন, কে? কি চাই?

দেবব্রত বললো, আমি।

গগনেন্দ্রনাথ বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইলেন নির্বাক হয়ে। তাঁকে দেখে মনে হয় পাথরের তৈরী মূর্তি।

দেবব্রত দু'এক পা এগিয়ে এলো ঘরের মধ্যে। অনেক দিন বাদে ছেলে-মেয়েরা বাইরে থেকে ফিরলে বাবা-মাকে প্রণাম করে। কিন্তু দেবব্রত প্রণাম করতে ভুলে গেছে। সে আবার বললো, আমি।

না, চিনতে কোনো ভুল হয় নি। যতই গোঁফ দাড়ির আড়ালে ঢাকা থাক দেবব্রতর মুখ, গগনেন্দ্রনাথ এক পলকেই চিনতে পেরেছেন। তবু কোন কথা বলতে পারছেন না।

দেবব্রত ঘরখানার চারদিকে চোখ বোলালো। তারপর খুব সাধারণভাবে বললো, প্রিয় কোথায়?

তক্ষুনি উত্তর দিলেন না গগনেন্দ্র—তখনও এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে। তারপর ভাঙা গলায় বললেন, দেবু, তুই একি করলি?

কাছাকাছি কোনো চেয়ার ছিল না, দেবব্রত একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বললো, বাবা, আপনি বসুন।

—দেবু, তুই কি সত্যি ফিরে এসেছিস?

—না এলেই বোধহয় ভালো হতো, তাই না?

—যদি এলি, তাহলে এত দেরি করে এলি কেন?

—বাড়িটা খুব ফাঁকা ফাঁকা লাগছে, আর সব কোথায়?

বাড়ির ভেতরের দিকের দরজার কাছে গিয়ে উঁকি মারলো দেবব্রত। উঁচু গলায় ডাকলো, প্রিয়! প্রিয়!

গগনেন্দ্র বললেন, প্রিয় বাড়ি নেই। তোর মা···তোদের মা মারা গেছেন।

দেবব্রত শান্তগলায় বললো, শুনেছি। আমি আগেই খবর পেয়েছি।

—কে খবর দিয়েছে তোকে?

—জাফর।

গগনেন্দ্র উত্তেজিত ভাবে জিজ্ঞেস করলেন, জাফর জানতো তোর কথা?

দেবব্রত আগেরই মতন শান্ত ভাবে বললো, আপনি জানতেন না?

—আমি? আমি যদি জানতাম···

—আপনি ঠিকই জানতেন।

গগনেন্দ্র হঠাৎ চুপ করে গেলেন। দেবব্রত বাড়ির মধ্যে দু'এক পা ঢুকে গেল।

গগনেন্দ্র তার সঙ্গে সঙ্গে এসে বললেন, আয়, ওপরে চল্। হাত মুখ ধুয়ে নে আগে। ট্রেন জার্নি করে এসেছিস।

দেবব্রতর হাতে একটা ছোট জামাকাপড়ের ব্যাগ সেটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে সে আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল সিঁড়ির দিকে। তার ভুরু দুটো কোঁচকানো, চোখ দুটো জলজল করছে এখন। এখন আজ সে তেমন শান্ত নয়।

—তুই এ বাড়ির ঠিকানা কোথা থেকে পেলি?

—খুঁজে পাওয়া খুব শক্ত নয়।

—আমরা সারা দেশটা তন্নতন্ন করেও তোকে খুঁজে পাইনি।

—যেখানে আমাকে নিয়ে যেত, শুধু সেই জায়গাটায় আপনি খুঁজতে যান নি। সেই জায়গাটা আপনি জানতেন না?

—দেব, তুই কি আমাকে শাস্তি দিতে এসেছিস?

—বাবা, আমি কোন উদ্দেশ্য নিয়েই আসি নি।

—সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত উঠে দেবব্রত চলে এলো দোতলার বারান্দায়। ঘরগুলো ফাঁকা পড়ে আছে। দেবব্রত এঘর ওঘরের দরজা ঠেলে ঠেলে দেখতে লাগলো। সে সব সময় কারুকে হঠাৎ দেখতে পাবার প্রত্যাশা করছিল।

ঝট করে মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করলো, মাধুরী কোথায়?

—তুই কেন এত দেরী করে এলি?

—মাধুরী কোথায়?

গগনেন্দ্র দু'দিকে মাথা নেড়ে ফ্যাকাসে মুখে বললেন, নেই।

—নেই মানে ? মরে গেছে।

—না। চলে গেছে।

—কোথায় ?

—জানি না।

দেবব্রত ফাঁকা ঘরগুলোর দিকে আর একবার তাকালো। তারপর কঠিন গলায় বললো, মাধুরী ছিল না এ বাড়িতে ?

—ছিল।

—তাহলে সে কোথায় গেছে ?

—কারুকে সে বলে যায় নি। হয়তো এলাহাবাদে তার দাদার বাড়িতে—

এলাহাবাদে সে নেই। আমি এলাহাবাদ ঘুরেই আসছি। সে কি হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে ?

—সে যেতে চাইলে আমি কি তাকে আটকে রাখতে পারি ?

দেবব্রত বললো, সে যেখানেই যাক, আমি তাকে ঠিক খুঁজে বার করব !

গগনেন্দ্র ব্যগ্র ভাবে জিজ্ঞেস করলেন, পারবি ?

—মাধুরী চলে গেল কেন ?

—কেন সে এতকাল পড়ে থাকবে এখানে ?

—ও যদি অন্য কারুকে বিয়ে করতে—কিংবা গোড়া থেকেই ওর দাদার কাছে থাকতো, তো সে কথা আলাদা ! কিন্তু এতগুলো বছর এখানে থাকার পর—

—অনেকগুলো বছর। এর মধ্যে অনেক কিছু বদলে গেছে। দেবু, তুই এত দেরি কেন করলি ? একটা সংসার তছনচ হয়ে গেল।

—আমার জন্য ?

—তবে কি আমারই জন্য ? আমার একটা ভুল·····কেউ ক্ষমা করতে পারলো না ? আমি তারপর সারাজীবন ধরে সেই ভুল কি শোধরাবার চেষ্টা করিনি ? তুই লেখাপড়া শিখেছিস—এ বাড়িতে তোর স্থান কোথায় ছিল তুই জানিস—তোকে সবাই ভালবাসতো—তোকে ঘিরেই আমাদের যা কিছু স্বপ্ন ছিল—তুই সেসব তুচ্ছ করে

চলে গেলি ? একবারও কারুর কথা ভাবলি না ? আজকালকার লেখাপড়া জানা ছেলে যে জন্ম পরিচয় নিয়ে—এতখানি···কত কুলি মজুরের ছেলেও আজকাল···

দেবব্রতর মুখে সেই বিচিত্র হাসিটা আবার ফিরে এলো। কাঁধের ঝোলাটা নামিয়ে সে বললো, আপনি ঠিকই বলেছেন। হয়তো আমারই ভুল। আমারই সব দোষ। আমি যদি সব কিছু অগ্রাহ্য করে কিংবা চোখ বুজে থাকতে পারতুম—

তাহলে আমার চাকরি বাকরি, বউ, সংসার—এসবই ঠিক থাকতো। কিন্তু কেন যে তা পারলাম না—

গগনেন্দ্র বললেন, তোর যদি মনে কোনো প্রশ্ন জাগতো, হঠাৎ যদি বা কোনো আঘাত লেগেও থাকতো—তা হলে তুই সোজা এসে আমাকে খোলাখুলি জিজ্ঞেস করলি না কেন সব ? এক কথায় সব ছেড়ে যেতে পারলি কি করে ?

—বাবা, ছেলেবেলা থেকে আপনি আমাদের সত্যি কথা বলতে শিখিয়েছিলেন। কিন্তু আপনি তো আমার কাছে কখনো সত্যি কথা বলেন নি ?

—তখনও সব কথা বলার সময় হয়নি।

—সত্যি কথা বলার কি সময় অসময় আছে ? বিশেষত, নিজের সম্পর্কে মিথ্যে কথা বলা কি কারুকে মানায় ?

—আমি কোনো মিথ্যে কথা তো বলিনি !

দেবব্রত মুখ নীচু করে নম্র গলায় বললো, আমি আপনাকে কোনো প্রশ্ন করতে আসি নি। আমি কোনো অভিযোগ নিয়েও আসি নি। আমি এসেছিলাম শুধু মাধুরীর সঙ্গে দেখা করতে।

গগনেন্দ্রনাথ হঠাৎ দপ্ করে জ্বলে উঠলেন। তীব্রভাবে বললেন, কোন অধিকারে ? কোন অধিকারে তুই দেখা করতে এসেছিস তার সঙ্গে। সে যে চলে গেছে, ভালোই হয়েছে। তুই সেই মেয়েটার জীবন নষ্ট করে দিস নি ? আমার ওপর রাগ হলেও তুই মাধুরীকে নিয়ে আলাদা সংসার পেতে থাকতে পারতিস না ? সে কি দোষ করেছিল ?

—একজন মানুষ যখন হঠাৎ গাড়ি চাপা পড়ে মরে যায়, তখন সে কি দোষ করে? কিংবা, তার স্ত্রী কি দোষ করে?

—এ তো হলো নিয়তির কথা! তোকে এত লেখাপড়া শেখালাম—

—কেন শেখালেন? কেন আমাকে বাড়ীর চাকর করে রাখেন নি? তাহলে কিছু বুঝতে শিখতাম না।

—এতদিনের স্নেহ মমতার বন্ধন—এই সব কিছু ছিঁড়ে চলে যাওয়া—তুই শুধু এটাই বুঝলি?

—না, ঠিক তা নয়। আমি একদিন বুঝতে পারলাম, এই সমাজে একদল শুধু ঠকে, আর একদল ঠকায়—জন্ম সূত্রে আমি এই দু'দলেই পড়ে গেছি। তখন প্রশ্ন উঠলো, আমি কোন্ দলে যাবো। বলুন, যার আত্মমর্যাদা জ্ঞান আছে। সে কোন্ দলে যাবে?

এ সব ফাঁকা ফাঁকা কথা। এই জন্য তুই নিজে পছন্দ করা একটা মেয়ের জীবনের সব সুখ নষ্ট করলি?

—ফিরে এলে কি আমি সুখ পেতাম? কি জানি! এ প্রশ্নের উত্তর আর এখন পাওয়া যাবে না। অনেক দেরি হয়ে গেছে।

দেবব্রত হাত ব্যাগটা আবার মাটি থেকে তুলে নিতেই গগনেন্দ্র ব্যস্তভাবে বললেন, তুই কোন্ ঘরে থাকবি? যে কোনো ঘরে থাকতে পারিস্, এই তো এটাই মাধুরীর ঘর ছিল—

দেবব্রত মাধুরীর ঘরের দিকে তাকালো। দেয়ালে তখনো তার নিজের ছবি ঝুলছে। আলনায় মাধুরীর দু'একটা শাড়ী। ড্রেসিং টেবিলের ওপর পড়ে আছে কালো কালো রঙের বড় চিরুনি।

দেবব্রত দরজাটা টেনে দিয়ে বললো, আমি থাকতে আসি নি!

—তুই চলে যাবি?

—মাধুরীর সঙ্গে দেখা না হয়ে ভালোই হয়েছে।

দেবব্রত দু'এক পা এগুতেই গগনেন্দ্র আর্ত গলায় ডাকলেন, খোকা—!

দেবব্রত ফিরে তাকালো। এবার সে নীচু হয়ে গগনেন্দ্রর পা ছুঁয়ে বললো, বাবা, আমার কোনো রাগ নেই কারুর ওপরে। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। এর পরেও জীবনে সুখ পাওয়া যায় কিনা আমি তাই খুঁজতে যাচ্ছি।

॥ শেষ ॥

আমার কিছু কথা

আমার একটা স্বপ্নের বাস্তবায়ন হলো এই ওয়েবসাইটের মধ্য দিয়ে । ছোটবেলা থেকেই আমার বইপড়া অভ্যাস । আমার পড়া প্রথম উপন্যাস শ্রী শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পথের দাবী',তখন আমি প্রাথমিক বিদ্যালয়েও ভর্তি হইনি ।তারপর থেকে প্রায় ২০ বছর ধরে অসংখ্য বই আমি পড়েছি,সংগ্রহের ইচ্ছা থাকলেও আর্থিক অবস্থা আমাকে সেই সুযোগ দেয় নি । ইন্টারনেটের সাথে পরিচিত হওয়ার পর থেকেই আমি বাংলা বই ডাউনলোডের সুযোগ খুঁজতাম,কিন্তু এক মূর্চ্ছনা ছাড়া আর তেমন কোন সাইট আমি পাইনি । মূর্চ্ছনাতেও নিয়মিত বই আপডেট হয়না বলে আমি নিজেই আমার অতিক্ষুদ্র সামর্থ্যের (এতই ক্ষুদ্র যে গ্রামীনের ইন্টারনেট চার্জ টা আমাকে টিউশনি করে জোগাড় করতে হয় ।

তবু আমি আমার চেষ্টা অব্যাহত রাখব, নতুন পুরাতন সমস্ত (বিশেষ করে পশ্চিমবাংলার লেখকদের বই) লেখাই আমি এখানে দেওয়ার আশা রাখি ।

আপনাদের কাছে একটা ছোট্ট অনুরোধ, আমাকে একটু সাহায্য করুন,তবে টাকা দিয়ে নয় । আমার এই ওয়েবসাইটে কিছু Google এর বিজ্ঞাপন আছে,যে কোনো একটা বিজ্ঞাপন মাসে একবার (হ্যাঁ,মাসে একবারই,তার বেশী নয়) যদি একটু ১০ মিনিট ব্রাউজ করেন,তাহলে আমি একটু উপকৃত হই । আপনাদের পছন্দের বইগুলো যদি ডাউনলোড চান তাহলে মেসেজবক্সে আমাকে মেসেজ দেবেন । আমি চেষ্টা করব বইটা দেওয়ার । যদি সফটওয়্যার দরকার হয়,তাহলে যান http://www.download-at-now.blogspot.com/ এই ঠিকানায় । সব সফটওয়্যার সিরিয়াল/ক্রাক/কিজেন যুক্ত । কোন সফটওয়্যার তৈরী করার দরকার হলেও আমাকে বলতে পারেন,আমি একজন সফটওয়্যার ডেভেলপার ।

মোবাইল: ০১৭৩৪৫৫৫৫৪১
ইমেইল: ayan.00.84@gmail.com